ডিসেম্বর ২০২২ ▪ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

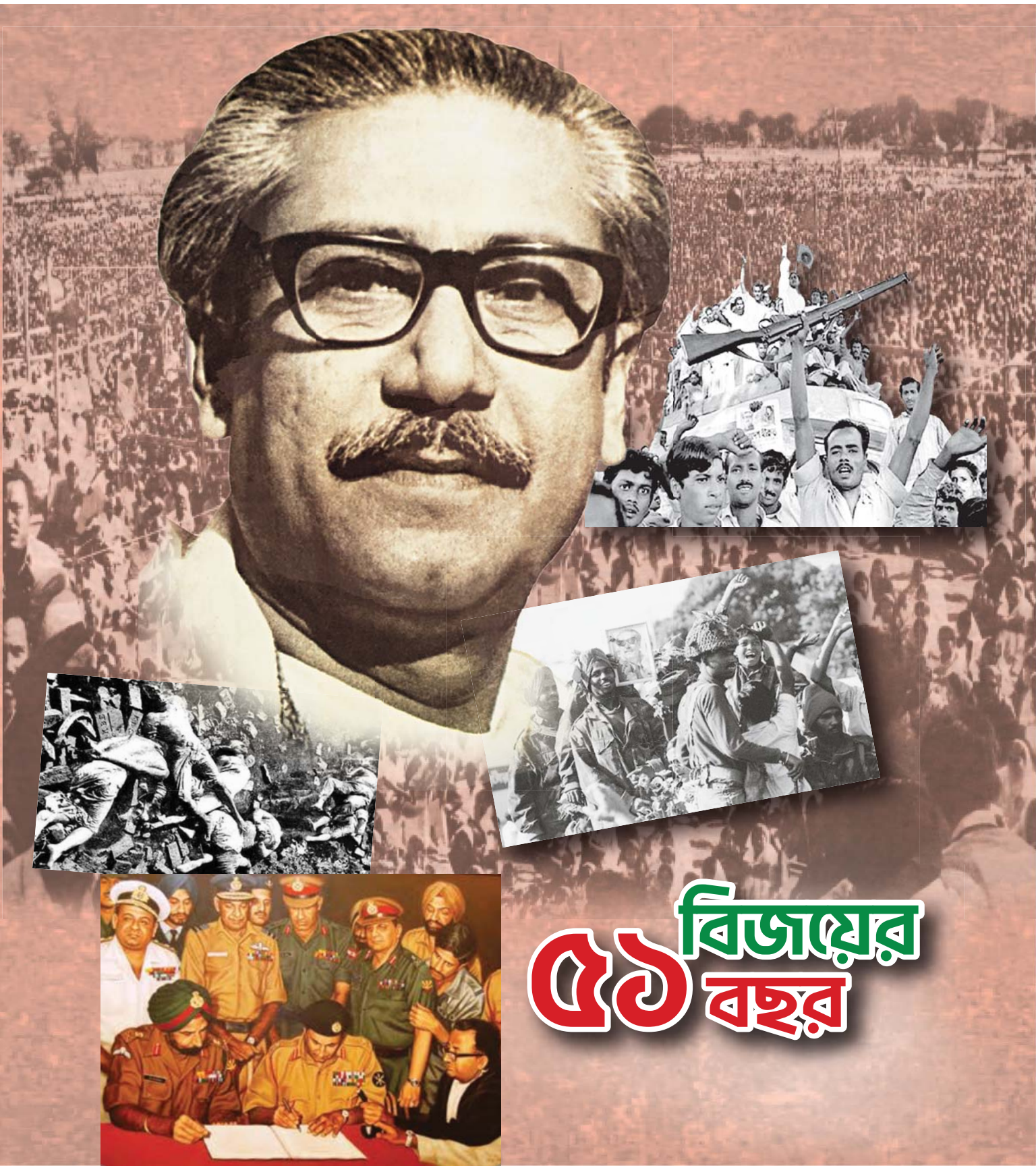

৫১ বিজয়ের বছর

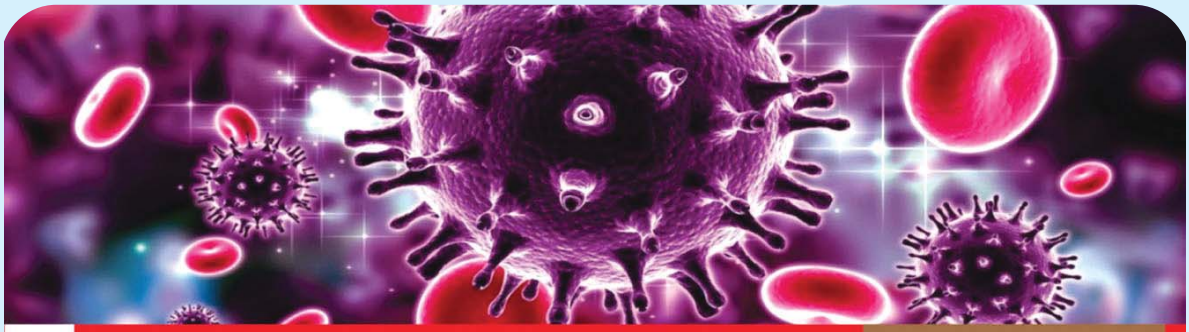

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০২২ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৯

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক: স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

সম্পাদকীয়

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির জাতিরাষ্ট্র স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'। যে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) থেকে ৭ই মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের ঘটনা এটাই প্রথম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ তেইশ বছরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে ২৫শে মার্চ রাতের গভীরে অপারেশন সার্চলাইটের নামে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদ, জাতীয় চার নেতা, তিন লাখ শহীদ ও সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোনের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ৯ই ডিসেম্বর। তাঁর অগ্রণী ভূমিকায় সমাজের উন্নয়নে অদম্য কীর্তি স্থাপন করেছেন তিনি। বেগম রোকেয়াকে নিয়ে এই সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাংলাদেশে একটি শোকাবহ দিন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসজুড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করে পরিকল্পিতভাবে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে জাতিকে মেধাশূন্য করতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা এই ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করতেই স্বাধীনতার পর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

হানাদারমুক্ত বাংলাদেশ সরকারের কার্যাবলি ৪
প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

রাইফেল রোটি আওরাত ৭
জাফর ওয়াজেদ

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ ৯
প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

প্রতিশোধ নাকি প্রতিকার: *সুলতানার স্বপ্ন*'র পাঠ পরিক্রমা ১২
প্রফেসর ড. নাহিদ হক

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস: বাঙালিই এই গৌরবদীপ্ত দিনের অধিকারী ১৪
সুজন বড়ুয়া

সেক্টর কমান্ডার লে. ক. এটিএম হায়দার ১৭
ইয়াকুব আলী

শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ ২০
নাসরীন মুস্তাফা

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও জাতির আলোকবর্তিকা ২৭
মুহা. শিপলু জামান

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ৩২
মোহাম্মদ শাহজাহান

মুক্তিযুদ্ধে খুলনার কমার্স কলেজ ৩৮
কাজী মোতাহার রহমান

মুজিবাদর্শের সূর্য সৈনিক শহিদ রুহুল ইসলাম ও তাঁর একগুচ্ছ একাত্তরের চিঠি ৪৬
আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য ৫৩
বশিরুজ্জামান বশির

দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার বাংলাদেশ ৫৫
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

যুব উন্নয়নে সরকারের নানা পদক্ষেপ ৬০
লায়লা জাহান

প্রতিবন্ধীরা বোঝা নয়, সম্পদ ৬৪
জেসিকা হোসেন

বিমান ও মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ ৬৬
হেলাল হোসেন কবির

গল্প

অনন্ত পথ যেন দ্রৌপদীর শাড়ি ২৩
ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

মেয়েটির খুব বদনাম ছিল ৪১
রফিকুর রশীদ

বীরাঙ্গনা মালতীবালা ৫১
সৈয়দা নাজমুন নাহার

দ্বিতীয় জীবন ৬২
দিলরুবা নীলা

কবিতাগুচ্ছ ৩০-৩১, ৩৬-৩৭, ৫৮-৫৯
মুহম্মদ নূরুল হুদা, আসলাম সানী, সোহরাব পাশা জাহাঙ্গীর আলম জাহান, অমিত কুমার কুণ্ডু, অর্ণব আশিক, মিয়াজান কবীর, মিলন সব্যসাচী, বাবুল তালুকদার, খান চমন-ই-এলাহি, শাফিকুর রাহী আতিক রহমান, সুজিত হালদার, অদ্বৈত মারুত আতিক আজিজ, প্রজীৎ ঘোষ, মো. আজগর আলী মিতা চক্রবর্তী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৭
প্রধানমন্ত্রী ৬৭
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৯
শিক্ষা ৭০
উন্নয়ন ৭১
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৭২
অর্থনীতি ৭৩
নারী ৭৩
সামাজিক নিরাপত্তা ৭৪
কৃষি ৭৪
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৬
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৭৬
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৭৭
ক্রীড়া ৭৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
না ফেরার দেশে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক আলী ইমাম ৭৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

বিজয়ের ৫১ বছর

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, অতঃপর ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রহসন, ১৯৭১ সালের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস বাঙালি গণহত্যা, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, মুজিবনগর সরকার গঠন, নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বে শুধু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই করেননি, তিনি একইসঙ্গে তাঁর দেশ পরিচালনার স্বল্পকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতকরণ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ করেছেন সুনিপুণভাবে। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় ও বাংলাদেশ একইসূত্রে গাঁথা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। বিশ্বে বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল'। বাংলাদেশের বিজয়ের সার্থকতা রয়েছে এর অগ্রগতি ও উন্নয়নে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 'হানাদারমুক্ত বাংলাদেশ সরকারের কার্যাবলি', 'রাইফেল রোটি আওরাত', 'বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ', '১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস: বাঙালিই এই গৌরবদীপ্ত দিনের অধিকারী', 'সেক্টর কমান্ডার লে. ক. এটিএম হায়দার', 'শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ', 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও জাতির আলোকবর্তিকা', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ', 'মুক্তিযুদ্ধে খুলনার কমার্স কলেজ' এবং 'মুজিবাদর্শের সূর্য সৈনিক রূহুল ইসলাম ও তাঁর একগুচ্ছ একাত্তরের চিঠি' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. ৪, ৭, ৯, ১৪, ১৭, ২০, ২৭, ৩২, ৩৮ ও ৪৬

হানাদারমুক্ত বাংলাদেশ সরকারের কার্যাবলি

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের ছয় দিন পর (২২.১২.১৯৭১) মুজিবনগর সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে। ১০ই জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৭.১২.১৯৭১ থেকে ০৯.০১.১৯৭২ পর্যন্ত সময়কালে উক্ত সরকারের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

মুজিবনগর সরকার কেন ছয় দিন পর ঢাকায় আসে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ঢাকায় তখন নিরাপত্তার আশঙ্কা ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্বে প্রায় ৬০/৭০ হাজার রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও বিহারিদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করেছিল। এদের চিহ্নিত করে নিবৃত্ত না করা পর্যন্ত ঢাকা শহর বিপদমুক্ত ছিল না। সেসময় ঢাকায় উপনীত ভারতীয় সামরিক কমান্ড কর্তৃক ঢাকা শহরের তথা বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিধান করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। তাছাড়া ১৬ই ডিসেম্বর রাত থেকে ঢাকা শহরে 'মুক্তিযোদ্ধা' পরিচয়ে অনেক যুবক চীনা একে৪৭ রাইফেল ও স্টেনগান হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এরা অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। পাকিস্তানি সৈন্য এবং সমর্থকদের ফেলে দেওয়া অস্ত্র এদের হাতে আসে। ঢাকাবাসী এদের নাম দেয় 'ষোড়শ বাহিনী'। এদের একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের গাড়ি, বাড়ি, দোকানপাট ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করার কাজে ব্যস্ত হয়। সুযোগসন্ধানী ষোড়শ বাহিনীর ('সিক্সটিনথ ডিভিশন' নামেও পরিচিত) কার্যকলাপ কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার মধ্যেও সংক্রমিত হয়। কে যে আসল মুক্তিযোদ্ধা, কে যে ষোড়শ বাহিনীর সদস্য তা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। দল পরিবর্তনকারী রাজাকাররাও লুটপাটে অংশগ্রহণ করে। এমনি সময়ে ১৮ই ডিসেম্বর রায়ের বাজারের কাটাসুর নামক ইটখোলায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেশের প্রায় দুশো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটতে থাকে। এ সময় বিহারি অধ্যুষিত অঞ্চলের নিরাপত্তার দায়িত্বও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিতে হয়। এসব বাস্তব সমস্যা ছাড়াও মুজিবনগর সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে কিছু জরুরি বিষয়াদি আলোচনার জন্য কয়েকদিন কলকাতায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল করার মতো অর্থ, সম্পদ ও কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা না করে সরকারের ঢাকায় ফেরা সমীচীন ছিল না। মুজিবনগর সরকার ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ও ভারতের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। অবশেষে ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে। বিলম্বে ঢাকায় ফেরার কারণে মন্ত্রিসভা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়।

ঢাকায় মুজিবনগর সরকারের দায়িত্ব

(১) মুজিবনগর সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা;
(২) মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয় বেসামরিক প্রশাসনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা;
(৩) গেরিলা যোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ করা;
(৪) প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বিহারিকে নিরাপত্তা বিধান করা;
(৫) বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা;
(৬) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করা;
(৭) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা;
(৮) বিদেশি সাহায্য-সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করা;
(৯) ভারতে অবস্থানগ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

মুজিবনগর সরকার ১৮ই ডিসেম্বর মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে আট জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে ঢাকায় প্রেরণ করে। তাঁরা হলেন– (১) মুখ্যসচিব: জনাব রুহুল কুদ্দুস; (২) রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা: জনাব এ. এফ. এম. এ. ফতেহ; (৩) সংস্থাপন সচিব: জনাব এম. নূরুল কাদের; (৪) পুলিশের মহাপরিচালক: জনাব এ খালেক; (৫) সচিব, তথ্য ও বেতার: জনাব আনোয়ারুল হক খান; (৬) সচিব, অর্থ: জনাব এ. কে. জামান; (৭) বেসামরিক বিমান চলাচল পরিচালক: উইং কমান্ডার মির্জা; (৮) বন্দর, জাহাজ ও অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিচালক: জনাব কিউ. এ. বি. এম. রহমান। তাঁরা ঢাকায় এসে গভর্নমেন্ট হাউসের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেন 'বঙ্গভবন'। মিন্টো রোড ও হেয়ার রোডের সংযোগ স্থানে অবস্থিত স্টেট গেস্ট হাউসের নাম দেন 'গণভবন'। পরবর্তীকালে শেরেবাংলা নগরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয় গণভবন এবং স্টেট গেস্ট হাউসের নাম হয় 'সুগন্ধী', যা বর্তমানে 'ফরেন সার্ভিস ট্রেনিং একাডেমি' নামে অভিহিত।

কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় চালু থাকে। মুজিবনগর সরকার ১৮ই ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

(ক) বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যস্ত করা ও সরকারি কর্মচারীদের পুনর্বিন্যাস করা;
(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নামে অ্যাকাউন্ট খোলা;
(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন;
(ঘ) ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু করা;
(ঙ) ১৯ জেলায় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার নিয়োগ করা, সামরিক ও পুলিশবাহিনীর জন্য পোশাক নির্ধারণ;
(চ) গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের মিলিশিয়া বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা;
(ছ) বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী ১৫ দিনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একটি তালিকা প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত (এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়);
(জ) মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ও আবুল ফতেহকে নতুন পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের সদস্যগণ ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১ সকালে ভারতের সামরিক বিমান পরিবহণের সহায়তায় ঢাকায় ফিরে আসেন। সেদিন সরকারের কিছু নথিপত্র সঙ্গে আনা হয়। অবশিষ্ট নথিপত্র কয়েকজন কর্মচারীর হেফাজতে কলকাতার অস্থায়ী কার্যালয়ে রেখে আসা হয়। পরে সেগুলো ঢাকায় আনা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ হেয়ার রোডে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গভবনে উঠেন।

২২শে ডিসেম্বর বিমানবন্দরে ও ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকা সচিবালয়ে অফিসার ও কর্মচারীদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই তিন মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হবে। সমাবেশের বক্তৃতায় তিনি সরকারি প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কেবিনেট রুমে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন:

(ক) রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার প্রচলন ও মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী বাংলায় লেখা, সব সাইনবোর্ড, হোল্ডিং নম্বর, গাড়ির নম্বর ইত্যাদি বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
(খ) যে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান লেখা আছে তা অবিলম্বে পরিবর্তন করে

বাংলাদেশ নাম প্রতিস্থাপন করা; স্টেট ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক নামে অভিহিত করা;

(গ) মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের 'জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী'তে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করার জন্য 'জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ড' গঠন করা;

(ঘ) শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ঢাকায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের আর্থিক সহযোগিতার জন্য শহিদ স্মৃতি ট্রাস্ট তহবিল গঠন, শহিদমিনার পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করার বিষয় আলোচিত হয় ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(চ) জাতীয় কাউন্সিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়;

(ছ) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(জ) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর যে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা বাতিল করা ও সংক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত সিলেবাসের ভিত্তিতে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(ঝ) সকল পাটকল জাতীয়করণ করা ইত্যাদি।

২৭শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করে আব্দুস সামাদ আজাদ, ফণীভূষণ মজুমদার, শেখ আবদুল আজিজ এবং জহুর আহমদ চৌধুরীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৮শে ডিসেম্বর অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব এইচ. টি. ইমাম। ২৭শে ও ২৯শে ডিসেম্বর মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে খোন্দকার মোশতাক আহমদকে বাদ দেওয়া হয়, তবে তাকে মন্ত্রিসভায় বহাল রাখা হয়।

২৮শে ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে Forces Act সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশের মুদ্রার নাম হবে টাকা। উক্ত বৈঠকে ১৯৭১-১৯৭২ সেশনে আমন ধান ও চালের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৩১শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠকে 'ফুড করপোরেশন' গঠন, পাটনীতি অনুমোদন, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের তথ্য ব্যবস্থা অনুমোদন, জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ড গঠন ও গণহত্যা অনুসন্ধান কমিটি বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐদিন ব্যাংকসমূহে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ব্যাংকসমূহ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু করে।

ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জাতীয়করণ করা হয় ৭ই জানুয়ারি ১৯৭২।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে। মুজিবনগর সরকারের ঢাকায় আগমনের পরদিন (২৩.১২.১৯৭১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত মি. দুর্গাপ্রসাদ ধর (ডি. পি. ধর) ঢাকায় আগমন করেন ও ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি ঢাকায় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ ও বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। তিনি ২৩ তারিখেই ১৮ নম্বর সড়কে অবস্থিত অস্থায়ী আবাসস্থলে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডি. পি. ধরের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য সচল করা, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ঐ সময় ভারতীয় নৌবাহিনীর সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দর সচল করার লক্ষ্যে নিমজ্জিত নৌযান ও ভাসমান মাইন পরিষ্কার করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে ১লা জানুয়ারির মধ্যেই চট্টগ্রাম বন্দরের ৮০ ভাগ সচল হয় ও বন্দরটি ২০ ফিট গভীরতা সম্পন্ন জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ২৪৭টি ছোটো-বড়ো রেলওয়ে ব্রিজের মধ্যে ১৯৪টি রেলওয়ে ব্রিজের মেরামত সম্পন্ন করা হয় ও ২৩টি রুটে রেল সার্ভিস চালু হয়। ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট ও উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৩রা জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে সব জেলার মধ্যে ডাক যোগাযোগ সচল করা হয়।

০৯.০১.১৯৭২ তারিখে রাষ্ট্রপতি কয়েকটি অধ্যাদেশ জারি করেন, যেমন:

(ক) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ০১ (০৩.০১.১৯৭২)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিত্যক্ত সব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণভার বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে;

(খ) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ০২ (০৪.০১.১৯৭২)-এর মাধ্যমে 'এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আদেশ' জারি করে 'পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স'কে 'এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল' নামকরণ করা হয় ও পিআইএ-এর সব সম্পদ অধিগ্রহণ করা হয়;

(গ) রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ-০১ (০৩.০১.১৯৭২): 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়করণ অধ্যাদেশ-০১'। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান এবং প্রাদেশিক সরকারের পরিবর্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সরকার প্রতিস্থাপিত হয়।

(ঘ) প্রজ্ঞাপন জারি (০৬.০১.১৯৭২): রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ও অফিসের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়।

এভাবে মুজিবনগর সরকার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৯ই জানুয়ারি ১৯৭২ এই ২৩ দিনে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে, ঢাকার সঙ্গে জেলা শহরগুলোর যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোর সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে ও সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ব্যাবসাবাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

[সূত্র : ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ১৯৭২-১৯৭৫*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০২২; এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫*, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১৩; মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ: *শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামল*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩।]

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাইফেল রোটি আওরাত

জাফর ওয়াজেদ

উনিশশো একাত্তর সালের জুন মাস। উপন্যাসের শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখে কলম গুটিয়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন গুলির শব্দ। শত্রু অধ্যুষিত দেশ। যে-কোনো সময় যে-কোনো মুহূর্তে হয়ে যেতে পারেন লাশ, এক গুলিতেই। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য তখন। শেষ লাইনটি লিখলেন– 'নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভা। সে আর কত দূরে। বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো। মা ভৈঃ। কেটে যাবে।' লেখকের এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালির তখনকার কামনা ও প্রত্যাশারই অভিব্যক্তি। তাঁর শেষ বাক্যের মতো কেটে অবশ্যই গিয়েছিল। পূর্ব দিগন্তে রক্ত লাল সূর্য উঠেছিল নয় মাস টানা যুদ্ধের পর। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন, টানা তিন মাস পরিশ্রমের ফসল তিনি গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বসে একটি জাতির যুদ্ধ জয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপন্যাস রচনার মতো কাজটি সহজ ছিল না। যে-কোনো সময় শত্রুরা এসে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারত রচনাকালে। কিন্তু না, তা হয়নি। তবে তাঁকে হাত ও চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল তাঁরই ছাত্ররা, যারা শত্রুদের সহচর হয়ে নিজ দেশের মানুষকে হত্যায় মত্ত হয়েছিল। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। গবেষণা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ সবই লিখেছেন। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে বসে যুদ্ধের প্রথম তিন মাসেই তিনি লিখে ফেলেন সেই অমূল্য দলিলটি। সেখানে বাঙালি জাতির শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন এবং তার থেকে মুক্ত ও যুদ্ধ জয়ের প্রেরণা।

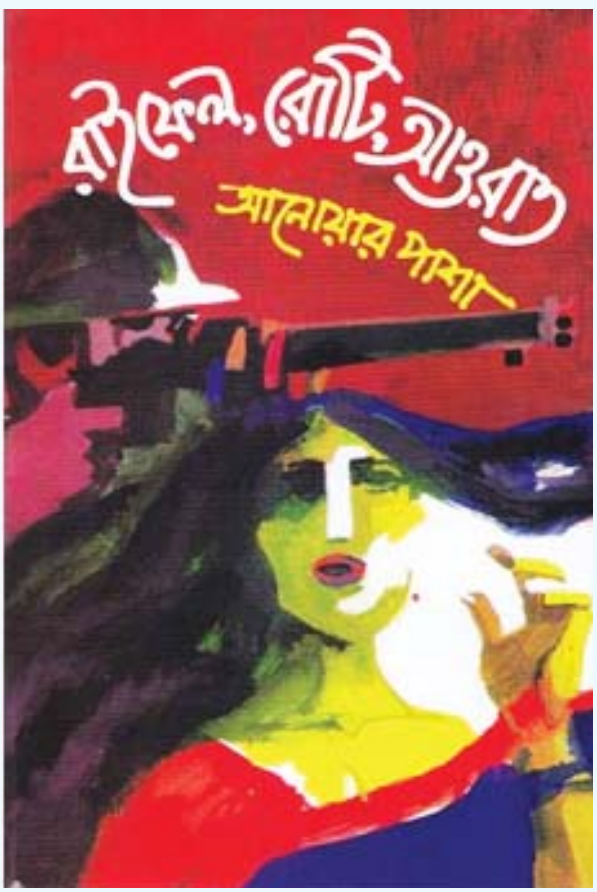

জুন মাসেই তিনি মুক্তির ভোর দেখেছিলেন। এপ্রিল মাসে যখন উপন্যাসটি রচনা শুরু করেন, প্রথম বাক্যটিই লিখলেন– 'বাংলাদেশে নামল ভোর'। কিন্তু এই ভোর সেই ভোর নয়, ২৫শে মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইট নামক পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যা পর্বের শুরু শেষের ভোর। সারারাতই গুলির শব্দ। ভয় জেগেছিল, তবে মৃত্যুভয় নয়। শহিদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশা তাঁর আত্মোপলব্ধিকে সামনে রেখে ব্রতী হয়েছিলেন উপন্যাসের আদলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রাখতে। উপন্যাসটি শুরু করেছেন ২৫শে মার্চ রাত শেষে ভোরের বর্ণনা দিয়ে। সে সময়ের যুদ্ধকালের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে লেখা আমাদের সমগ্র ইতিহাসে একটি মাত্র উপন্যাসই পাওয়া যায়– তা হচ্ছে *রাইফেল রোটি আওরাত*। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মধ্য থেকে প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনাকে বিবৃত করেছেন তিনি। অবশ্য মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-বিভীষিকার এমন দৃশ্যপট আঁকা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং দুরূহ হলেও আনোয়ার পাশা তা করতে পেরেছেন তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। বলা যায়, এই বাংলায় যারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পাড়ি দেবেন, তারা এদেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংসতম অধ্যায়ের এই নির্ভেজাল দলিল পাঠ করে শিউরে উঠবে যেমনি, তেমনি উপলব্ধি করতে পারবে আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমের নজিরহীন দৃষ্টান্ত। এতে গৌরববোধ করা তাদের জন্য হবে স্বাভাবিক। হানাদার কবলিত বাংলাদেশে কামান-বারুদের মুখে বসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় আনোয়ার পাশা যা করতে পেরেছেন, তা অভাবনীয়। একাত্তরের মার্চের ভয়াবহ কয়েকটি দিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় ক্ষীণ পরিধিতেই গ্রন্থের ঘটনাপ্রবাহ সীমিত। কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত এ সময়সীমার আগে ও পরে বহুদূর বিস্তৃত। নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি তাঁর উপন্যাসের কাহিনিকে রক্তাক্ত করে গেছেন। গ্রন্থের নায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সুদীপ্ত শাহিন, যার অন্তরালে মূলত আনোয়ার পাশা নিজেই।

২৫ ও ২৬শে মার্চ সুদীপ্তর কাছে মনে হয়েছে দুটি রাত নয়, দুটি যুগ যেন। পাকিস্তানের দুই যুগের সারমর্ম। বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানিদের দুই যুগের মনোভাবের সংহত প্রকাশ মূর্তি। শাসন ও শোষণ। যে-কোনো প্রকারে বাংলাকে শাসনে রাখো, শোষণ কর। শোষণে অসুবিধা হলে, শাসন তীব্র কর। আরও তীব্র শাসন। আইনের শাসন যদি না চলে? চালাও রাইফেলের শাসন, কামান-মেশিনগানের শাসন। কামান-মেশিনগানের সেই প্রচণ্ড শাসনের রাতেও তিনি বেঁচে ছিলেন। সুদীপ্তর ধারণা, মৃত্যু অত্যন্ত সহজ এবং স্পর্শযোগ্য ছিল, তা হলেও সেদিন তার মৃত্যু হয়নি। কেন তিনি মরলেন না, তিনি জানেন না। অমন সহজ মৃত্যুটি তার ভাগ্যে ছিল না বোধহয়। কত হাজার হাজার লোক সেদিন কত সহজে কাজটি করতে পারল– পারলেন না সুদীপ্ত। তিনি মরতে পারলেন না। অতএব সুদীপ্তকে এখন ভাবতে হচ্ছে– মরে যাওয়াটা অতি সহজ নয়। কিন্তু সুদীপ্ত তথা আনোয়ার পাশা ২৫শে মার্চ রাতে মরেননি, তবে ১৪শে ডিসেম্বর ঘাতকদের হাতে প্রাণদান করতে হয়েছে। আলবদর বাহিনী তাঁর হাত ও চোখ বেঁধে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। যারা ছিল তাঁর ছাত্র। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের টর্চার সেলে নির্মম নৃশংস অত্যাচার শেষে তাঁকে হত্যা করে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয়। ২৫শে মার্চ রাতে যখন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক হল এবং শিক্ষকদের

কোয়ার্টারে হামলা চালায়, সে সময় বেঁচে গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক আনোয়ার পাশা।

তিনি জন্মেছিলেন মুর্শিদাবাদের কাজীশাহ গ্রামে। রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ পাস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। ১৯৫৮ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শহিদ হবার পূর্ব পর্যন্ত এই বিভাগেই কর্মরত ছিলেন। মাত্র ৪৩ বছর বয়স তাঁর, যখন ঘাতকরা তাঁকে হত্যা করে। তিনি রাজনীতি করতেন না। তবে কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন। সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধী হলেও চলে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের খাঁটি ধারক হয়ে উঠলেন। ১৯৬৪ সালে পাবনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে তিনি দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন এবং ৩০ হিন্দু ছাত্রকে বাঁচিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে। কিন্তু পারলেন না একই শক্তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে, মুসলিম বাবা-মায়ের সন্তান হয়েও। উপন্যাসে তিনি এক সংলাপে পাকিস্তানপন্থি শিক্ষক ড. আব্দুল খালেকের মুখে আইয়ুব খান আমলের বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেছেন বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থিদের মনোভাব। 'তোমাদের বাঙালিদের অবস্থা হয়েছে খাঁচার পাখির মতো। দীর্ঘকাল হিন্দুয়ানীর খাঁচায় তোমরা পোষা ছিলে। এখন ছাড়া পেলেও তাই উড়তে পারছ না। মানে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করতে পারছ না।' পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানকে কখনও মুসলমানের মর্যাদা দেয়নি। পাকিস্তানপন্থি চরিত্রটিও পাওয়া যায় এই সংলাপে। 'পাকিস্তানের সংহতি সকলের আগে। যেজন্য আছে আমাদের সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনী আমাদের গৌরব ও গর্বের বস্তু। যে-কোনো মূল্যে তারা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করবে। দেশকে তারা বিচ্ছিন্ন হতে কিছুতেই দেবে না।' শিক্ষক আব্দুল খালেক এখানেই থেমে থাকেননি। আরও বলেন, 'ইসলামের স্বার্থে, পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে দরকার হলে আমাদের সেনাবাহিনী একশ বছর পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত রাখবে। দেশে সামরিক শাসন চালাবে। ইসলাম ও পাকিস্তানের স্বার্থে তা হবে বিলকুল জায়েজ।' সে কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশপন্থি শিক্ষক ড. মালেকের বাড়িতে ঢুকে হানাদাররা তার টাকা ও গয়না লুটপাটের পর বাথরুমে লুকিয়ে থাকা দুই কন্যা ও স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেল গনিমতের মাল হিসেবে, যারা আর ফেরেননি। যাবার সময় খতম করে যায় ড. মালেককে। শহিদ আনোয়ার পাশা জগন্নাথ হলের মাঠে গণহত্যার বর্ণনা করেছেন। 'সমস্ত জীবনটাকেই একটা তীব্র বিরূপ বলে সুদীপ্তর মনে হলো যখন তিনি জগন্নাথ হলের মাঠে সদ্য পুঁতে দেওয়া নারী-পুরুষের কারও হাতের আঙুল, কারও পায়ের কিয়দংশ মাটি-ফুঁড়ে বেরুনো বৃক্ষ-শিশুর মতো মাথা তুলে থাকতে দেখলেন। কত শব এইখানে পুঁতেছে ওরা? এবং এমনি কত স্থানে!'

উপন্যাসের শেষদিকে রয়েছে ২৫শে মার্চের ভয়াবহ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনো মতে যারা পালিয়ে বেঁচেছে, তাদের উদ্দেশে দলপতির ভাষণ যা বাঙালির উজ্জীবনী মন্ত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল সেসময়। দলপতি বলেছিলেন, 'বাঙালিরা এখন মরতে শিখেছে, অতএব তাকে মেরে নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা এখন পৃথিবীতে কারও নেই। জানবে, মৃত্যুকে ভয় করে যারা মৃত্যুকে এড়াতে চায় তারাই মরে।' জুন মাসে সমাপ্ত লেখার বাক্যগুলোই পরবর্তীকালে বাঙালির জন্য সত্যে পরিণত হয়েছিল। বাঁচার জন্য সংগ্রাম কিংবা আধমরা হয়ে বেঁচে থাকা ছিল বাঙালিদের জন্য তখন খোলাপথ। আনোয়ার পাশা সাহসী ছিলেন, আধমরা হয়ে বেঁচে থাকেননি। রক্তের অক্ষরে তিনি মৃত্যুপুরীতে বসে জীবনের সাধনা করেছিলেন উপন্যাসে। তাই পাকিস্তানি হানাদাররা এসেছে নরপশুর রূপ ধরে।

যে নবপ্রভাতের জন্য এত দুর্ভোগ, এত আশা, এতখানি ব্যাকুল প্রতীক্ষা ছিল উপন্যাসের নায়ক তথা আনোয়ার পাশার নিজের, তা সত্য সত্যই এল। কিন্তু আনোয়ার পাশা তা দেখে যেতে পারেননি। দূরদর্শী মহান শিল্পস্রষ্টা ছিলেন বলেই তিন মাসের ঘটনাকে সামনে রেখে একাধারে ঐতিহাসিক দলিল আর সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁকে হত্যা করা গেছে; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেশভাগ, পাকিস্তানি শাসকদের মনোভাব হানাদারদের আচরণ সবই উপন্যাসে এসেছে। শুধু তাই না, ঘাতকের দল তথা আলবদর বাহিনীর দল জামায়াতে ইসলামি প্রসঙ্গও পাই। যেভাবে জামায়াতে ইসলামি নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের কুৎসা রটিয়েছিল, নির্বাচনের পর তার ভীত হওয়ার কিছু কারণ ছিল বৈকি। সেই জামায়াতের অঙ্গ সংগঠন বদর বাহিনী তাঁকে রেহাই দেয়নি। যেমন রেহাই পায়নি লোরকা, তেমনি আনোয়ার পাশাও। ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস এলে মনে পড়ে সকল শহিদের কথা। শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ পেশাজীবী শহিদদের। আনোয়ার পাশা– তাঁরা এই মহৎ সৃষ্টির জন্য দেদীপ্যমান হয়ে থাকবেন।

সেদিন যাঁরা শত্রু সেনাদের ও তাঁদের দোসরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা দু'কারণে শ্রদ্ধেয়। প্রথমত, তাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না, মুক্তবুদ্ধির চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের অসাধারণ করে তুলেছিলেন। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশকে মুক্ত করার। এই আকাঙ্ক্ষা সেদিন ছিল সর্বজনীন। সেদিন এই দেশেরই কিছু কিছু নরাধম শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। তাদের নানা ধরনের নৃশংসতায় সহায়তা করেছে এবং হানাদারদের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু এই পিশাচেরা ছিল সংখ্যায় নগণ্য।

বাঙালির গভীর দেশপ্রেমের সামনে তারা খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও দেশের মানুষের এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান বানচাল হয়ে গিয়েছিল। সেই একই শক্তিকে যারা পুনর্বাসিত করেছে, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে, পুনরুজ্জীবিত করেছে, তারা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা দীর্ঘ সময় ধরেই করছে তাদের সংখ্যা আজ আর নগণ্য নয়। উনিশশো একাত্তরের এই দিনে যেসব বুদ্ধিজীবী শহিদ হয়েছিলেন, আজকের বুদ্ধিজীবীরা এখনকার শত্রুদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে সেই শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

জাফর ওয়াজেদ: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

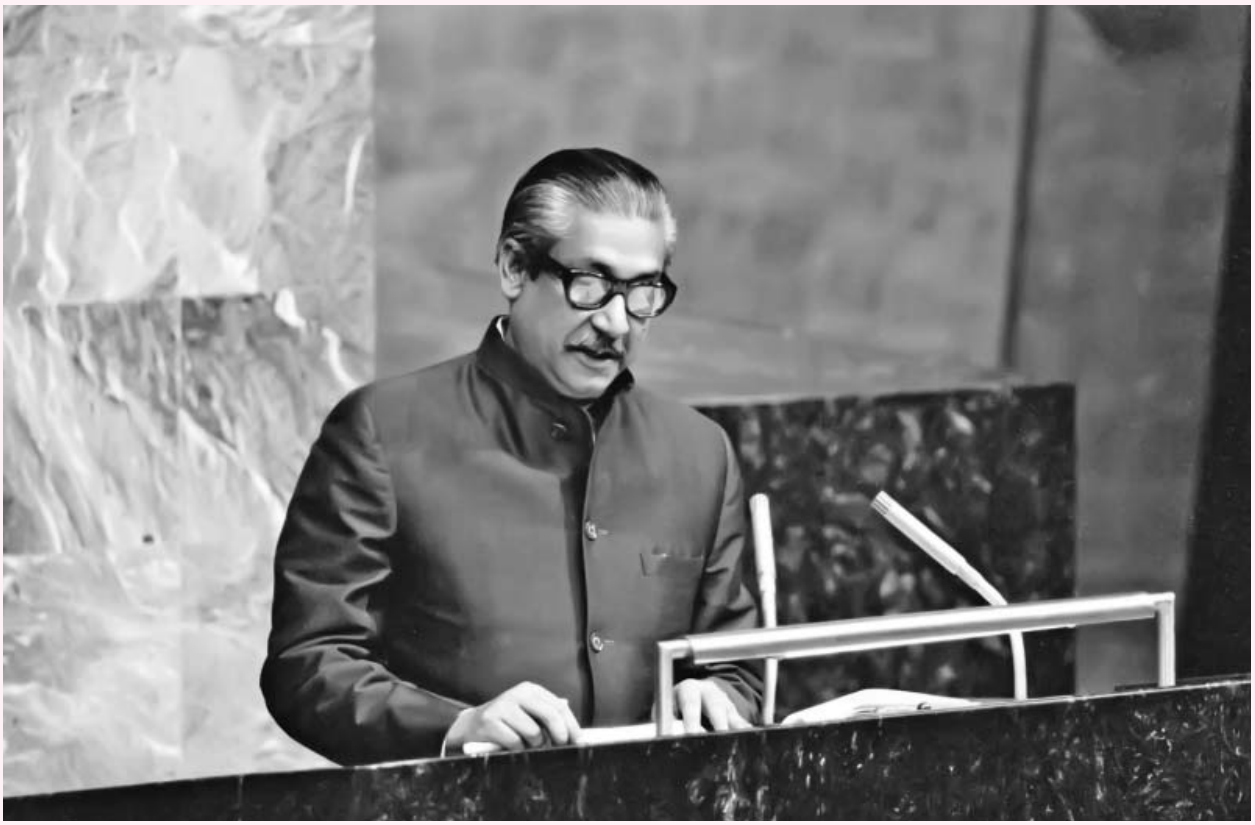

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশটির জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি লন্ডনে, ১০ই জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এ বিষয় গুরুত্বসহ তুলে ধরেন। ১০ই জানুয়ারি বক্তৃতায় বলেন, 'আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেওয়ার জন্য সাহায্য করুন।' বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনায়কচিত ব্যক্তিত্ব ও কূটনৈতিক তৎপরতায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে ৯৫টি, ১৯৭৩ সালে ২০টি এবং বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে মোট ১৩৫টি দেশ স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ১৮ই এপ্রিল কমনওয়েলথের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যের সূচনা ঘটায়। যদিও পাকিস্তান, চীন ও তাদের মিত্রদের ষড়যন্ত্রে বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘের সদস্য হতে বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথ জাতিসংঘের পরে সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ সংস্থার অনেক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়। এ কারণে বঙ্গবন্ধু এর সদস্যপদ লাভে শুরু থেকে আগ্রহ দেখান। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতি, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে সহযোগিতা বাংলাদেশকে টিকে থাকতে সহায়ক হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতির কারণে পাকিস্তান কমনওয়েলথ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় নেতা ড্যানিয়েল কার্কের বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে কমনওয়েলথে বাংলাদেশের সদস্য করে নেওয়ার আলোচনার সূত্রপাত। সংস্থার মহাসচিব দু'মাস পর ৬ই এপ্রিল বাংলাদেশকে সদস্য করে নেওয়ার ঘোষণা দেন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন সংস্থার মহাসচিব আর্নল্ড স্মিথ ১৮ই এপ্রিল। বাংলাদেশ তখন থেকে এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৮ই এপ্রিল সংস্থাটিতে সদস্য হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে সংস্থার আইনমন্ত্রীদের সম্মেলনে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন অংশ নেন। ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে কানাডার অটোয়াতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অংশ নেন। ৭ই আগস্ট সম্মেলনে বক্তৃতায় তিনি দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে ধনী দেশগুলোর সহযোগিতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য কমনওয়েলথ সদস্যদের সহায়তা কামনা করেন। প্রায় ৩২টি দেশের নেতৃবৃন্দের ৯ দিনব্যাপী এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রশংসিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে নবীন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্থান করে নেয়। পরবর্তীতে দেশগুলোর অনেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। পরের মাসে অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে তাজউদ্দীন আহমদ অংশ নেন। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর খাদ্য সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ নেয়।

১৯৭৫ সালের মে মাসে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে

কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের বৈঠকেও বঙ্গবন্ধু যোগ দেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে দু'দেশের অমীমাংসিত বিহারিদের পাকিস্তান ফেরত নেওয়া, পাকিস্তানের কাছে পাওনা সম্পদের বিষয় তুলে ধরেন। সম্পদ বণ্টন আলোচনার পর সম্মেলন শেষে যুক্ত ইশতাহারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদ বণ্টন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্মেলনের পর কয়েকটি আরব দেশ এই ইস্যুতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আর আলোচনা হয়নি।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই দলীয় নীতিতে জোটনিরপেক্ষতার কথা বলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয় জোটনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর থেকেই এর সদস্য হওয়ার কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭৩ সালের ৫-৯ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যোগ দেন এবং তখন বাংলাদেশ সদস্য হয়। সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর শুধু মতামত বিনিময়ের সুযোগই হয়নি, তাঁর বক্তৃতা নেতাদের প্রশংসাও অর্জন করে। ৮ই সেপ্টেম্বর দেওয়া বক্তৃতায় তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা হিসেবে ঘোষণার জন্য জোর দাবি জানান। এ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় তিনি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে তাদের সহযোগিতা চান এবং তিনি প্রতিশ্রুতিও পান। মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়ে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়। এখানে সিদ্ধান্ত হয় ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে আবার বিষয়টি আলোচিত হবে। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের পর যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি তারা স্বীকৃতি দেয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু বলেন, আলজিয়ার্সে আমি ৬০ জন নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা সকলে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশ বিশ্ব সংস্থায় সদস্যপদ লাভের প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছে।

ওআইসি

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযুক্ত করলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিম বিশ্বের বড়ো সংগঠন ওআইসির সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতেই ওআইসির মহাসচিব ঢাকা সফর করেন। ১৯৭৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হয়। সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের অবদান রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ওআইসির ৫ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ১৯৭৪ সালের জুনে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এতে অংশ নেন। এ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয় বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে কো-অপ্ট করা হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জেদ্দায় ওআইসির সম্মেলনে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত সম্পদ বণ্টন বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরে। কয়েকজন সদস্য সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেয় পরের মাসে অনুষ্ঠিত জোটের নবম শীর্ষ সম্মেলনে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। কিন্তু পরের মাসে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের ফলে বিষয়টি আর কখনোই আলোচনায় আসেনি।

জাতিসংঘ

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি লন্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির আহ্বান জানান। দেশে ফিরে ১০ই জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভায়ও একই দাবি জানান।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের রিলিফ কার্যক্রমের (UNRAD) আওতায় বাংলাদেশে পরিচালিত ক্ষয়ক্ষতির জরিপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তান বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বিষয় স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১২৪৯ কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত জাতিসংঘের আওতায় পাওয়া যায় মাত্র ৯৯.৪ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে জাতিসংঘের রিলিফ কার্যক্রম ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চলে। এছাড়াও চালনা বন্দরে জাহাজ উদ্ধার, বাঙালি শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তানে আটক বাঙালি ফেরত, বিহারিদের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন কার্যক্রমে জাতিসংঘ সহায়তা দেয়। জাতিসংঘের আওতায় সদস্যদের সহযোগিতা ১৯৭২ সালের পরও অব্যাহত থাকে। উপমহাদেশের দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে জাতিসংঘ মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে।

১৯৭২ সালের ১৭ই অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের আসন লাভ করে। উপমহাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কার্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাঁর সফরের পর পরই ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয় সমাধানের পথ সহজ হয়। ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। একই বছর ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। তিনি ভাষণে দারিদ্র্য বিমোচনে ধনী দেশগুলোর অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সেই অর্থ শান্তি ও খাদ্য কেনার কাজে ব্যবহারে আহ্বান জানান। জাতিসংঘ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ নতুনভাবে পরিচিত হয়। এরপর বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে জাতিসংঘে ভূমিকা পালন করে। পরের মাসেই বাংলাদেশ জাতিসংঘে এশীয় গ্রুপের সভাপতির মর্যাদা লাভ করে।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই তৎপর হয়। ১২ই জানুয়ারি মিশরভিত্তিক আফ্রো-এশিয়া সংহতি পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। একই মাসের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সঙ্গেও বাংলাদেশের চুক্তি হয়। ১৮ই এপ্রিল কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রবেশ করে। ১৯৭২ সালের মধ্যেই

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD), ইউনেসকো, গ্যাট, কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) -এর সদস্য হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ আইএলও'র কার্যকরী বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হয়।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ ১৯৭২-১৯৭৫

ক্র. নং	সংস্থার নাম	সদস্যভুক্তির তারিখ
১.	কমনওয়েলথ	১৮ই এপ্রিল ১৯৭২
২.	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল	৯ই মে ১৯৭২
৩.	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	১৭ই মে ১৯৭২
৪.	আঙ্কটাড (UNCTAD)	২০শে মে ১৯৭২
৫.	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা	২২শে জুন ১৯৭২
৬.	বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা	১লা জুলাই ১৯৭২
৭.	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা	২রা জুলাই ১৯৭২
৮.	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক	২রা জুলাই ১৯৭২
৯.	পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)	১৭ই আগস্ট ১৯৭২
১০.	আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন	২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২
১১.	ইউনেসকো	১৯শে অক্টোবর ১৯৭২
১২.	কলম্বো পরিকল্পনা	৩রা নভেম্বর ১৯৭২
১৩.	গ্যাট	৯ই নভেম্বর ১৯৭২
১৪.	কৃষি ও খাদ্য সংস্থা	২৩শে নভেম্বর ১৯৭২
১৫.	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	১৯৭৩
১৬.	জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন	৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
১৭.	ওআইসি	২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
১৮.	জাতিসংঘ	১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ এবং এতে ভূমিকা রাখা ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বিভিন্ন সরকারি ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাংলাদেশে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। নরওয়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (নোরাড), অক্সফাম, সুইডেনের শিশু রক্ষা ফেডারেশন, ইউনেসকো, কেয়ার, ইউনিসেফ, রেডক্রস, বিশ্বব্যাংক, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক সংস্থা সিডা বিভিন্ন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পুনর্গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন– বিশ্বব্যাংক, এডিবি অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়।

রেডক্রস বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও মানবিক সমস্যা সমাধানে তৎপরতা চালায়। রিলিফ কার্যক্রম, পুনর্বাসনে সহায়তা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনে ভূমিকা রাখে। রেডক্রস বাংলাদেশে আটকেপড়া বিহারিদের প্রথম থেকেই সহায়তা দিতে থাকে। রেডক্রসের সহায়তায় গড়ে ওঠে ৬৬টি ক্যাম্প যেখানে বিহারিদের আশ্রয় দেওয়া হয়। বিহারিদের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের জন্য রেডক্রসের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে রেডক্রস ভূমিকা রাখে।

এভাবে বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয়ে এসব সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নব্য স্বাধীন দেশটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে কয়েকটি সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেন। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের প্রচারণায় বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতাও এতে বন্ধ হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ব দরবারে যে নতুন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এর প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে।

প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন: চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ ও সাবেক ডিন, কলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতিসংঘ রেজুলেশনে বঙ্গবন্ধুর উক্তি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'

৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব ডায়ালগ অ্যাজ এ গ্যারান্টি অব পিস, ২০২৩' শীর্ষক রেজুলেশনে সন্নিবেশিত হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক উক্তি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয় (Friendship to all, malice towards none)'। কোভিড পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ পরিষদের প্লেনারিতে রেজুলেশনটি উত্থাপন করে তুর্কমেনিস্তান। পরে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। রেজুলেশনের চতুদর্শ অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হয় বঙ্গবন্ধুর ঐ উক্তি।

বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক উক্তিটি এবারই প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ রেজুলেশনে সন্নিবেশিত হলো। রেজুলেশনটির চতুদর্শ অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর উক্তিটি যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাহলো 'দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্ব স্বীকার করে এবং গঠনমূলক সহযোগিতা, সংলাপ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার চেতনায় সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ নয় মর্মে জোর দেওয়া হলে তা এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সহায়তা করবে, (Recognizing the importance of combating poverty, hunger, disease, illiteracy and unemployment, and emphasizing that friendship to all and malice towards none, in the spirit of constructive cooperation, dialogue and mutual understanding, will help to achieve these objectives)'।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণদানকালে জাতির পিতা যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন, সেগুলোর ধারণামূলক ভিত্তি থেকে এই অনুচ্ছেদটির প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়। রেজুলেশনটিতে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশসহ ৭০টি দেশ কো-স্পন্সর করে।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

প্রতিশোধ নাকি প্রতিকার: *সুলতানার স্বপ্ন*'র পাঠ পরিক্রমা

প্রফেসর ড. নাহিদ হক

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) মাত্র বাহান্ন বছর জীবনপ্রাপ্ত এই নারী বাঙালি মুসলমান নারীর শিক্ষা অর্জনের ভীষণ তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্ব-সমাজের নারীরা শিক্ষার অভাবে নানাভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত। নারীদের জাগিয়ে তোলায় তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে বিবেচিত হন। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভবে তিনি শুধু লেখনীর মাধ্যম নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য– যা তিনি জীবনকালে পরিচালনা করেছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন। বিবাহ-পরবর্তী সময়ে স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের নামের পদবি যুক্ত হয়। তিনি নিজেও ব্যবহার করেছেন তাঁর নামে 'মিসেস আর. এস. হোসেন' [(MRS) R.S. Hossain] যার বাংলাকরণে 'বেগম রোকেয়া' নাম ব্যবহার করেছেন সমালোচকগণ ।

নারী অধিকার, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান-মনস্কতা, সমাজ সংস্কারমূলক কাজে অংশগ্রহণ প্রভৃতি প্রবণতাসমৃদ্ধ এই নারীর সাহিত্যকর্ম অনেক নয়, কিন্তু যা তিনি রচনা করেছেন সেই সব

সৃষ্টকর্ম আজও আমাদের আলোচনার দাবি রাখে তাঁর এমনি একটি রচনা *সুলতানার স্বপ্ন*। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের *সুলতানার স্বপ্ন* পড়তে গেলে মনে পড়ে রোকেয়া সময়কালীন শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৮৬-১৯৩৭) কবিতাটি–

... ছেলেরা সব খেলা ফেলে বই নে
বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া লোকের পিঠে চড়ে।
... মজার দেশে মজার কথা বলবো কত আর;
চোখ খুললে যায় না দেখা মুদলে পরিষ্কার। (মজার দেশ)

তবে রোকেয়ার 'নারীস্থান' 'মজার দেশ' নয়। সরস উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে রোকেয়া বাঙালি মুসলিম নারীর দৈন্যদশা চিত্রিত করেছেন। 'Sultana's Dream' নামে এটি প্রথম ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে *Indian Ladies Magazine*-এ প্রকাশিত হয়। পরে এটি বাংলায় অনুবাদ করা হয় *সুলতানার স্বপ্ন* নামে। সুলতানার স্বপ্নের রাজ্য ইউটোপিয়া অর্থাৎ কল্পরাজ্য। কিন্তু এই স্বপ্ন কিংবা কল্পনা যাই বলি না কেন, এর মধ্য দিয়ে রোকেয়া নারীর প্রতি সমাজ-সংসারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি উপস্থাপনে এক ধরনের সাহিত্যকৌশল অবলম্বন করেছেন। *সুলতানার স্বপ্ন*-এর মধ্য দিয়ে হাস্যরস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে নারীর অধিকার, নারী মুক্তির চিত্র উঠে এসেছে। *সুলতানার স্বপ্নে* নারীদের অবস্থানগুলোতে পুরুষদের স্থাপন করে একদিকে যেমন নারীর বঞ্চনার দিকটি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে নারীর মেধা, সামর্থ, মর্যাদা, শিক্ষা, নৈতিকতা, সততার বিষয়গুলো আমাদের মনে করিয়ে দেন। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান নারীদের কোণঠাসা করে অন্তঃপুরবাসিনী করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে নারীর লজ্জা ও সেই লজ্জায় পুরুষের দৃষ্টি থেকে রক্ষায় পর্দা প্রথার প্রসঙ্গে সুলতানা ও ভগিনী সারার কথোপকথন উল্লেখযোগ্য–

> (ক) আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়। *(সুলতানার স্বপ্ন)*
>
> (খ) আমরা পর্দানশীল স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই। *(সুলতানার স্বপ্ন)*
>
> (ক)-এ ভগিনী সারার সুলতানাকে 'পুরুষভাবাপন্ন' অর্থাৎ পুরুষের মতো ভীরু ও লজ্জাশীলা– এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে 'নারীস্থান'-এর চিত্র উঠে আসে, যা তৎকালীন মুসলমান সমাজজীবনে প্রায় অসম্ভব। (খ)-এ উল্লিখিত সুলতানার বক্তব্যে আমরা অনুধাবন করতে পারি অভ্যাসহীনতার মর্মব্যথা– যে পাখি উড়তে সক্ষম তার ডানা পিঞ্জরে রেখে অকেজো করে দিয়েছে।

সমাজে নারীর নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ পুরুষের পশুত্বের প্রকাশ ও আচরণ। ভগিনী সারা অন্তঃপুরবাসিনী সুলতানার অবস্থা শুনে তাকে অন্যায় আচরণ বলেই মন্তব্য করেন। যেখানে নিরীহ নারী অন্তঃপুরে আবদ্ধ, আর পুরুষেরা মুক্ত-স্বাধীন জীবন ভোগ করছে। ভগিনী সারাদের 'নারীস্থান' নিরাপদ কারণ নারীস্থানে পুরুষেরা অন্তঃপুরবাসী আর নারী-মুক্ত স্বাধীন জীবনযাপন করে। সুলতানার বক্তব্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান চিত্র আরও স্পষ্ট হয়–

> জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু, – তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য

হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! – তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে। *(সুলতানার স্বপ্ন)*

সামাজিক এই বিধিবিধান নারী মুক্তির বড়ো রকম অন্তরায়। স্বীকার্য যে নারী, পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল, কিন্তু মেধা-মননে নারীকে দুর্বল বিবেচনা করা অবান্তর। অথচ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তেমনটি সংঘটিত হয়। 'নারীস্থানে' শারীরিক বল বিবেচনায় শ্রম বণ্টন করা হয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চায় 'নারীস্থানে'র নারীগণ নিযুক্ত। 'আকারে প্রকারে বড়ো হলেই মেধা মস্তিষ্কেও বড়ো হবে, তেমনটি নয়। হস্তী মেধা মস্তিষ্ক তো মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু তো মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে!' *(সুলতানার স্বপ্ন)*

সমাজে শিশু ও নারী স্বাস্থ্য কোনো না কোনোভাবে অবহেলিত হয়। এদের যথার্থ পুষ্টির অভাব নিত্যদিনের বিষয়। ফলে রোগশোক সহসাই তাদের আক্রান্ত করে। মা ও শিশুমৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'নারীস্থান'-এ অন্নাভাব নেই ফলে অকালমৃত্যুও নেই।

নারী শিক্ষার জন্য নারীস্থানে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ও পরবর্তী সময়ের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা হয়। বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নারীস্থানের দুটো বিশ্ববিদ্যালয় মেধা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হয়–

(ক) সূর্যতাপে রন্ধন প্রণালি,

(খ) জল সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'জলধর বেলুন',

(গ) যুদ্ধ জয়ের জন্য (হাতিয়ারবিহীন) সূর্যতাপ সংরক্ষণ ও শত্রুপক্ষের চোখে প্রতিফলন,

(ঘ) ওজন মাপার সাপেক্ষে হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহার করে আকাশপথে দ্রুত ভ্রমণ,

(ঙ) বিদ্যুৎ-এর সাহায্যে চাষাবাদ,

(চ) 'নারীস্থান'-এ যাতায়াতের জন্য যানের চেয়ে পায়ে হাঁটার ব্যবস্থা বেশি, ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

সুলতানার স্বপ্ন নারীস্থানে ভ্রমণে ভগিনী সারা সুলতানাকে পুরুষ প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, পুরুষেরা দুষ্টু, বাতুল কিংবা উন্মাদ এবং অলস। তথাকথিত কর্মক্ষেত্রে পুরুষেরা কর্মের চেয়ে অহেতুক সময় অতিবাহিত করেন বেশি বলেই সারা মনে করেন। পুরুষের চুরুট খেতে যে সময় ব্যয় হয় তার পরিমাণ নিছক কম নয়। ফলে একজন নারী যে সময়ের মধ্যে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারে, সেক্ষেত্রে পুরুষ অধিক সময় ব্যয় করে। একজন নারীর জন্যে কর্মক্ষেত্রের ও গৃহস্থালির কাজ দুটোই যথার্থভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় যা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাছাড়া 'নারীস্থানে' তাদেরই প্রবেশাধিকার আছে যারা কর্মঠ। কিন্তু যে দেশের নারীগণ অন্তঃপুরে অলংকার সজ্জিত হয়ে বসন-ভূষণে পুতুলে পরিণত হয়েছে, নারীস্থানে তারা বাণিজ্য অথবা অন্য কাজে আসতে অক্ষম। সমাজ গঠনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষ অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কেননা, 'নরনারী উভয়ে একই সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ,– পুরুষ শরীর, রমণী মন!' (*সুলতানার স্বপ্ন*)। ভগিনী সারার এই মন্তব্য যথার্থে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের মূলমন্ত্র। সুলতানা স্বপ্নে দেখেছিলেন হাস্যরস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার, নারী মুক্তির চিত্র। *সুলতানার স্বপ্ন*-এর মাধ্যমে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী-পুরুষের সমতা বিধান চেয়েছেন। তবে সমাজের দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে আক্রোশের প্রকাশ ঘটাতে পিছপা হননি। সর্বোপরি বলতে হয়, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে *সুলতানার স্বপ্ন*– যা নারী মুক্তির এক অনবদ্য চেতনা বয়ে আনে।

প্রফেসর ড. নাহিদ হক: বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, nahid.juniv.bangla@juniv.edu

জাতিসংঘ শান্তি পদক পেলেন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা

মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ আর্মড পুলিশ ইউনিট-২ (রোটেশন-৪)-এর ১৪০ জন সদস্যকে জাতিসংঘ শান্তি পদক পরিয়ে দেন মালির জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের পুলিশ প্রধান পুলিশ কমিশনার জেনারেল বেটিনা প্যাট্রিসিয়া বুগানি। ২৮শে নভেম্বর এ উপলক্ষে ব্যানএফপিইউ-২ কর্তৃক আয়োজিত মেডেল প্যারেড ও শান্তি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তার ডেলিগেশন টিমসহ রাজধানী বামাকো থেকে ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার দূরে মিনুসমা গুন্দাম ক্যাম্পের হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন। এসময় ব্যানএফপিইউ-২-এর কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহিনুর আলম খান প্রধান অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। সেখানে প্যারেড কমান্ডার ব্যানএফপিইউ-২-এর অপারেশনস অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে একটি চৌকস দল সশস্ত্র সালাম ও বর্ণিল প্যারেড প্রদর্শন করেন। মনোমুগ্ধকর প্যারেড প্রদর্শনী শেষে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের ১৪০ জন পুলিশ সদস্যকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক প্রদান করা হয়। মালিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মিনুসমা ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পদক দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি জেনারেল বেটিনা প্যাট্রিসিয়া বুগানি তার বক্তব্যে প্রতিকূল পরিবেশেও অত্যন্ত সুনামের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ পরিচালনা করে স্থানীয় জনগণের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে উল্লেখ করে ব্যানএফপিইউ-২-এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম যেমন ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন, বিনামূল্যে ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ, স্কুলে শিক্ষাসামগ্রী ও মসজিদে উপহারসামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া তিনি শান্তিরক্ষা মিশনে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও তাদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বেরও প্রশংসা করেন।

প্রতিবেদন: দেবাশিষ সরকার

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

বাঙালিই এই গৌরবদীপ্ত দিনের অধিকারী

সুজন বড়ুয়া

১৬ই ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। একান্ন বছর আগে ১৯৭১ সালে আমাদের জীবনে এসেছিল পরম আনন্দের ও গৌরবের এদিনটি। যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভের সৌভাগ্য সব জাতির হয় না। যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া বিশ্বের মাত্র ১৯টি দেশের মধ্যে এক অনন্য দেশ বাংলাদেশ। বাঙালি এক গর্বিত জাতি। অন্যরা যুদ্ধ করে জয় লাভ করলেও পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো জাতির কিন্তু বিজয় দিবস নেই। একমাত্র বাঙালি জাতিই এমন একটি গৌরবদীপ্ত দিনের অধিকারী। তাই এদিনটি একেবারে অন্যরকম।

অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে জয় লাভের দিন ১৬ই ডিসেম্বর। এদিনটিকে পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক বছর। অপেক্ষার সে বছরগুলো ছিল অনেক কষ্ট, বেদনা, গ্লানি ও উদ্বেগের। উদ্বেগময় সেই অন্ধকার কাল পেরিয়ে এক সাগর অশ্রু আর রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাসের এক যুদ্ধের ভেতর দিয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছাই বিজয়ের বন্দরে, ১৬ই ডিসেম্বরে। এদিন আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা। আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমিকে পেয়েছি একান্ত আপন করে। পেয়েছি নিজস্ব একটি মানচিত্র, জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সংগীত। বড়ো মধুর সে পাওয়া।

অবশ্য এর আগেও একবার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম আমরা। তবে সেটা ছিল নামমাত্র। সেটা ১৯৪৭ সালের কথা। তখন আমরা মুক্ত হয়েছিলাম ইংরেজদের শাসন থেকে। কিন্তু ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে গেলেও আমরা আবার ঘটনাচক্রে হয়ে পড়ি পরাধীন।

ইংরেজরা ভারতবর্ষকে ভারত-পাকিস্তান নামে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডকে। এর নাম দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের অন্য অংশটিকে তখন বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তার দূরত্ব ছিল এক হাজার মাইল। শুধু দূরত্বের ব্যবধান নয়, ছিল ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিরও ব্যবধান। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষা বাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু। পুরো পাকিস্তানের শাসনভার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। সুতরাং শাসনের নামে শুরু হয় শোষণ, নির্যাতন। বাঙালি প্রতি পদে পদে, ধাপে ধাপে বঞ্চিত হতে থাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুট করে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তোলা হয় সম্পদের পাহাড়। তাদের সে অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে দামাল বাঙালি। ধাপে ধাপে আঘাত হানতে থাকে শাসনযন্ত্রে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৫৭-র স্বায়ত্তশাসন দাবি, ১৯৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মার্চে দুরন্ত বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তির সংগ্রামে। ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী শুরু করে নির্মম নিধনযজ্ঞ। এর মধ্য দিয়ে আসে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণা। ২৫শে মার্চ মধ্য রাতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়্যারলেস যোগে ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। অবশ্য এর আগে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের এক জনসমুদ্রে স্বাধীনতার ডাক দেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' প্রায় আঠারো মিনিটের অলিখিত সেই অসামান্য ভাষণে বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে দিয়েছিলেন চূড়ান্ত দিক নির্দেশ। মূলত সেদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় বাঙালির স্বাধীনতার অদম্য সংগ্রাম। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর সেই সংগ্রাম রূপ নেয় মুক্তিযুদ্ধে। সেদিন দলমতনির্বিশেষে এদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। দখলদার হানাদার

বাহিনীকে বিতাড়িত করতে ঐক্যবদ্ধ হয় গোটা দেশের মানুষ। এই জীবনপণ যুদ্ধ চলে নয় মাস। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের মানুষের ওপর চালায় নজিরবিহীন গণহত্যা, হিংস্রতা, বর্বরতা ও নৃশংসতা। তবুও যুদ্ধে একে একে বিজয় ছিনিয়ে আনতে থাকে বাংলার দামাল ছেলেরা।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজয় দিবসের মাত্র দুদিন আগে ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ঘটায় আরেক মর্মান্তিক ঘটনা। ১৪ই ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে এ দেশের সেরা লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ-চিকিৎসক-সাংবাদিক প্রকৌশলীদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। যেসব আলোকিত মানুষকে হত্যা করা হয় তাঁদের কয়েকজন হলেন– মুনীর চৌধুরী, সিরাজুদ্দীন হোসেন, আলীম চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, ফজলে রাব্বী, নিজামুদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার পাশা, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, রাশীদুল হাসান, সেলিনা পারভীন, সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেম ও মননশীলতায় অগ্রণী এক প্রজন্ম, চিন্তা ও মানবতার দিশারি। পাকিস্তানি বাহিনীর সেই হীন চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল অচিরেই বাংলাদেশ নামের যে নতুন দেশটির জন্ম হবে, সে দেশটি যেন জ্ঞান-মনীষা, মেধা ও মননে সহজে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেছিল এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। তারা নিরস্ত্র, অরক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁদের হাত-পা-চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। হত্যা করে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে। কী কাপুরুষতা! কী নৃশংসতা! এসব অবর্ণনীয় রক্তাক্ত স্মৃতি ভোলা যায় না।

রক্ত আর অশ্রুর বন্যায় ভেসে অবশেষে আমাদের জীবনে আসে পরম কাঙ্ক্ষিত ১৬ই ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এদিন বিকেলে সে সময়ের রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী হাতের অস্ত্র ফেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল বিজয়ী বীর বাঙালির সামনে। স্বাক্ষর করেছিল পরাজয়ের সনদে। পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের।

দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে জীবনদান করেন লাখো বাঙালি। ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ ও অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয়ের দিনটিতে আনন্দের পাশাপাশি তাই বেদনাও বেজে ওঠে বাঙালির বুকে। বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় আমরা ১৬ই ডিসেম্বর স্মরণ করি জানা-অজানা সেসব লাখো শহিদকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সাহিত্যে-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-ক্রীড়াঙ্গনে বাঙালি জাতি চমক দিয়ে চলেছে দেশে দেশে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের মাত্র বারোটি টেস্ট ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের একটি। আমাদের তুখোড় খেলোয়াড় সাকিব আল হাসান ক্রিকেটের সব কটি ভার্সনে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ছিলেন দীর্ঘদিন। আমাদের দুই তরুণ নারী আরোহী নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজনীন বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিমালয়ের চূড়া স্পর্শ করেছে। আজ আকাশে-বাতাসে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। এ বছর আমাদের নারী ফুটবল দল সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন উন্নয়নের সূচকে ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকে পেছনে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু আর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। বিজ্ঞানসহ কম্পিউটার-প্রযুক্তির অগ্রগতি সব ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য নিয়ে আসছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত। দেশে প্রথমবারের মতো মেট্রোরেল ব্যবস্থা স্থাপন করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব স্বপ্নময় উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে একমাত্র স্বাধীনতা লাভের জন্য। সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে।

কিন্তু বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ৫১ বছরের চলার পথ মসৃণ ছিল না কখনও। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়া, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি থেকে মুক্তির সংগ্রামের পাশাপাশি চলেছে সামরিক শাসন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধের বিচার, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ ছিল বড়ো চ্যালেঞ্জ। এসব আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই মোকাবিলা করতে হয়েছে প্রবল বন্যা, ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও। এই বন্ধুর পথপরিক্রমায় অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে। কিন্তু শত বাধা-প্রতিবন্ধকতাতেও হতোদ্যম হয়নি এদেশের সংগ্রামী মানুষ। হারায়নি সাহস। লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে অব্যাহত আছে বাঙালির এগিয়ে যাওয়া।

এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন কোভিড মহামারির বাধা সফলভাবে ডিঙিয়ে বাঙালি জাতি উদ্‌যাপন করেছে ইতিহাসের দুটি গৌরবময় সন্ধিক্ষণ। ২০২০ সালে বাঙালি পালন করেছে বাংলাদেশের স্থপতি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবর্ষ। ২০২১ সালে পালন করেছে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী। যে-কোনো জীবিত বাঙালির জন্য এ দুটি গৌরবদীপ্ত ঘটনার সাক্ষী হতে পারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমরা সত্যি সে সৌভাগ্যের অধিকারী।

এই গৌরবের ইতিহাস ছুঁয়ে কোভিড মহামারি মাড়িয়ে এগিয়ে চলার পথে এবারের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উৎসবে সাম্প্রতিক কিছু উদ্দীপনামূলক অর্জন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। যেমন ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেসকো কর্তৃক পেয়েছে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। সেইসাথে ২০১৭ সালের নভেম্বরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের মধ্যে পরিশ্রমী, কর্মঠ ও সততায় লাভ করেছেন শীর্ষে অবস্থানের স্বীকৃতি। এ দুটি গৌরবময় স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও উদ্বেলিত জাতি ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় উপহার দিয়ে শেখ হাসিনাকে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করে নেয়। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারির অস্বাভাবিক পরিস্থিতিসহ যাবতীয় সংকট প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দেশ এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে। বর্তমানে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তীব্র সচেতন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আসন্ন সংকট মোকাবিলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

তাই কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও এবারের বিজয় দিবসেও আমাদের আনন্দ কমবে না। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের আকাশ ছোঁয়ার দিন। বিজয়ের এই দিনে আমরা আজ বিনম্র চিত্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেমন শ্রদ্ধা জানাই, তেমনি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। প্রধানমন্ত্রী, আপনার অপূর্ব চমকপ্রদ গতিশীল নেতৃত্বে আমরা সত্যি একদিন আকাশ ছোঁব।

সুজন বড়ুয়া: সাহিত্যিক

সেক্টর কমান্ডার লে. ক. এটিএম হায়দার

ইয়াকুব আলী

আবু তাহের মো. হায়দার (মুকতু মিয়া) আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। সেক্টরটির বিস্তৃতি ছিল নোয়াখালী থেকে ফরিদপুরের মাদারীপুর, মাঝে লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোটা ঢাকা শহর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং শরীয়তপুর। এলাকার আয়তন ১৯,৫২৬ বর্গকিলোমিটার।

হায়দারের পিতৃভূমি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের কান্দাইল গ্রামে। পিতার নাম মোহাম্মদ ইসরাইল। তিনি ছিলেন অবিভক্ত ভারতের পুলিশ ইন্সপেক্টর। পিতার কর্মস্থল কলকাতার ভবানীপুরে এটিএম হায়দারের জন্ম ১৯৪২ সালে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে হায়দার দ্বিতীয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হায়দারের পিতা পোস্টিং পান পাবনায়, পরে সিরাজগঞ্জ, সেখান থেকে পঞ্চগড়। একের পর এক হয়রানিমূলক বদলির প্রেক্ষাপটে অধৈর্য হয়ে ১৯৫১ সালে হায়দারের পিতা চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরে সেটেল হন। গ্রহণ করেন মোক্তারি পেশা।

হায়দারের রক্তের মধ্যেই ছিল দুরন্তপনা। শৈশব থেকেই হায়দারের মনোবাসনা ছিল বড়ো হয়ে সামরিকবাহিনীতে যোগ দেবেন। জীবনে বীরত্বপূর্ণ কিছু করবেন। এ ভাবনা নিয়েই মগ্ন থাকত কিশোর হায়দার। তবে পরিবারের সদস্যরা ছিল ছেলের এই বাতিকের ঘোর বিরোধী। যুদ্ধে সামরিকবাহিনীর প্রচুর লোকক্ষয়ের কারণে এদেশের মানুষ মিলিটারি ক্যারিয়ারকে অনিরাপদ মনে করত। রামানন্দ হাই স্কুল (কিশোরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) থেকে ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক ও গুরুদয়াল কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে আইএসসি পাস করে বিমানবাহিনীর রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষায় অংশ নিয়ে হায়দার শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত ঘোষিত হন। হায়দার ভেঙে পড়েন। কিন্তু তাঁর পণ যে করেই হোক সামরিকবাহিনীতে যোগ দেবেনই। তার ধারণা জন্মে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রিক্রুটমেন্ট টেস্টে অংশ নিতে পারলে সামরিকবাহিনীতে যোগদান সহজ হবে। নতুন ফন্দি আঁটেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে পড়াশোনা করবেন বলে বাবা-মার কাছে বায়না ধরেন। ছেলের সুমতি হয়েছে মনে করে পরিবার অনুমতি দেয়। ১৯৬১ সালে একা একা চলে যান পশ্চিমে। হায়দার ভর্তি হন লাহোর ইসলামিয়া কলেজে। ১৯৬৩ সালে বিএসসি পাস করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন পরিসংখ্যান বিভাগে। এমএসসি প্রথম পর্ব শেষ করার পর চতুর্থ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি ওয়ার কোর্সে রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাঙালি হিসেবে যাতে বৈষম্যের শিকার হতে না হয় সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করতে হায়দার তাঁর আবেদনে স্থানীয় অভিভাবক (লোকাল গার্ডিয়ান) হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্থানীয় শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছিলেন। যাহোক, প্রার্থীর প্রাক-পরিচিতি যাচাই অর্থাৎ ভেরিফিকেশনের জন্য পুলিশ কিশোরগঞ্জের বাসায় গেলে তাঁর পরিবার প্রথমবারের মতো জানতে পারে যে, হায়দার সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন!

যোগদানের পর অ্যাবোটাবাদে কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ছয় মাস প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে গোলন্দাজ বাহিনীতে কমিশন লাভ করেন হায়দার। পোস্টিং হয় পাঞ্জাবের মূলতান সেনানিবাসে। শারীরিকভাবে শক্ত-সমর্থ, সুদর্শন, স্মরণশক্তি ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তিনি সিনিয়রদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। মনোনীত হন স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের স্পেশাল কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য। ৩৬০ জনের মধ্যে হায়দারসহ মাত্র দুই জন বাঙালি অফিসার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (এসএসজি) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। ১৯৬৯ সালে ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতির পর তিনি পোস্টিং পান কুমিল্লা সেনানিবাসে কমান্ডো ব্যাটালিয়নে। পরের বছর ১৯৭০ সালে বোন সিতারা বেগম ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে হায়দারের অনুপ্রেরণায় আর্মি মেডিকেল কোরে যোগ দিয়ে পোস্টিং নেন কুমিল্লায়।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু হওয়ার পর থেকে সেনাবাহিনীর ভেতরেও শুরু হয় অস্থিরতা। বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের ভেতর পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দানা বাঁধতে শুরু করে। পশ্চিমারা নেয় ছলচাতুরীর আশ্রয়। দুর্বল করে ফেলার অংশ হিসেবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি ইউনিটগুলোকে এদিক-ওদিক মোতায়েন করা শুরু হয়। এসময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল ৮টি : তিনটি পশ্চিম পাকিস্তানে আর ৫টি পূর্ব পাকিস্তানে: ১ম বেঙ্গল যশোরে, ২য় বেঙ্গল জয়দেবপুরে, ৩য় বেঙ্গল সৈয়দপুরে, ৪র্থ বেঙ্গল কুমিল্লায় আর ৮ম বেঙ্গলের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামে।

১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চের প্রথমদিকে চতুর্থ বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হায়দারকে পাঠানো হয় ঢাকায়। বলা হয় উত্তরবঙ্গে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেখানেই হয়ত পাঠানো হবে। ঢাকায় হায়দারের সাথে বাঙালি কয়েকজন অফিসারকেও রাখা হয় তাবুতে। উত্তরবঙ্গে পাঠানোর কোনো লক্ষণই নেই। একবার ছাউনি থেকে বের হয়ে মতিঝিলে বোনের বাসায় গিয়ে ফিরতে চাইলে হায়দারের পিঠে রাইফেল তাক করে পশ্চিম পাকিস্তানি

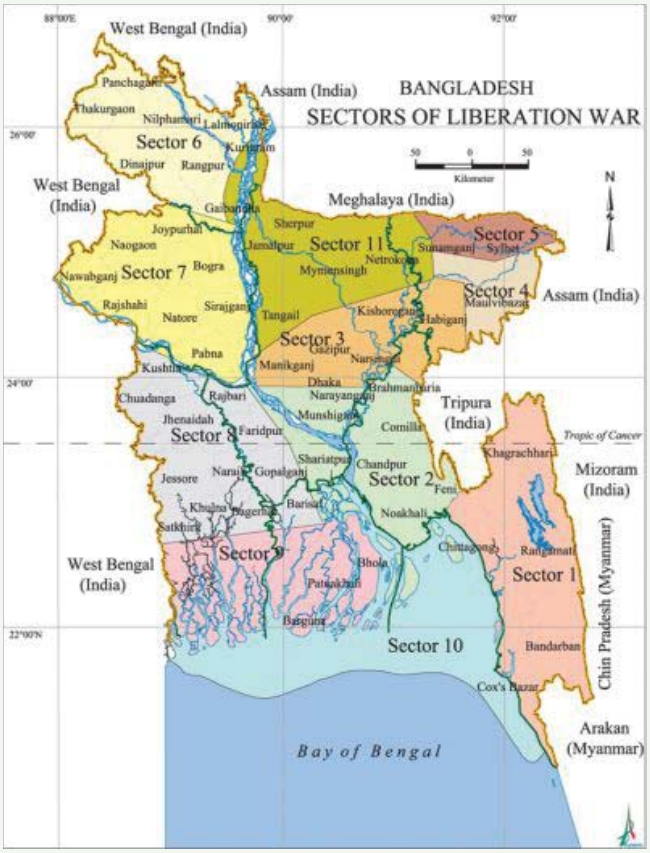

সিপাই তাঁকে তাঁবুতে পৌঁছে দেয়। এভাবে প্রায় অন্তরিন অবস্থায় ক্যাপ্টেন হায়দার দিনাতিপাত করতে থাকেন। বেতন চাইলে তাঁকে কর্মস্থল কুমিল্লা থেকে বেতন উত্তোলনের পরামর্শ দেওয়া হয়। ২০শে মার্চ আর্মি ট্রাকে করে কুমিল্লা ফিরে লক্ষ করেন ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি থমথমে। আঁচ করতে পারেন সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। লক্ষ করেন বাঙালিদের আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। ২৫শে মার্চ বসের কক্ষে বসে হায়দার বুঝতে পারলেন যে, সেদিনই মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় মেসে ফিরে বাথরুমের জানালা ভেঙে পলায়ন করেন। সঙ্গে নেন পিস্তলখানা। সারেন্ডার করে বন্দি করার জন্য ততক্ষণে হায়দারকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকারে ক্রলিং করে ঝোপঝাড়, চড়াই-উতরাই পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন তিনি।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে ক্যাপ্টেন হায়দার এক গ্রামে রাত কাটান। পরদিন হেঁটে যাত্রা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, মার্চ মাসের শুরু থেকেই চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বাধীন একটি কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোতায়েন করা হয়েছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। ২৭শে মার্চ শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল। এদের সঙ্গে মেজর খালেদ মোশাররফ যোগ দিয়ে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিমান হামলার ভয়ে খালেদ ও শাফায়াত বাধ্য হন বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে সীমান্তের দিকে সরে যেতে। তারা হবিগঞ্জের মাধবপুরের সীমান্ত সংলগ্ন তেলিয়াপাড়ায় ঘাঁটি গাড়েন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেখে যান ছোটো একটি ইউনিটকে বিচ্ছিন্ন সেনা সদস্যদের গাইড করার জন্য। এই ইউনিটে এসে রিপোর্ট করেন হায়দার। ৩০শে মার্চ হায়দার তেলিয়াপাড়ায় পৌঁছে খালেদ মোশাররফের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করেন। কমান্ডো পরিচয় জেনে খালেদ অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে হায়দারকে গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের গোটা সময় তারা এক সঙ্গে যুদ্ধ করেন। নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছিল এ বন্ধন স্থায়ী হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

শুরুর দিকে খালেদ মোশাররফ ক্যাপ্টেন হায়দারকে পাকিস্তানিদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার কাজ দেন। তার অংশ হিসেবে তিনি কুমিল্লা-ঢাকা, কুমিল্লা-সিলেট, কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক ও রেলপথের অনেক সেতু ও কালভার্ট ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেন। হায়দারকে লোকবল ও বিস্ফোরক দিয়ে সহায়তা দেয় ভারতের বিএসএফ। ১৪ই এপ্রিলের হায়দার কিশোরগঞ্জের বাসায় যান। সাথে ছিলেন দুজন ভারতীয় কমান্ডো। কিশোরগঞ্জ শহরে সেনাবাহিনীর প্রবেশ ঠেকাতে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ রোডের তারেরঘাট ব্রিজ ও মুসল্লি রেলসেতু ধ্বংস করে ফিরে যান কর্মস্থলে।

তেলিয়াপাড়াকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সামরিক সদর দপ্তর বলা হয়ে থাকে। ৪ঠা এপ্রিলে তেলিয়াপাড়া চা বাগানের বাংলোয় মেজর খালেদ মোশাররফের অস্থায়ী ঘাঁটিতে গুরুত্বপূর্ণ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। লে. ক. এম এ রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর সিআর দত্ত, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, লে. ক. এসএম রেজা, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরীসহ বাঙালি বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার সেখানে সমবেত হন। ওপারের বিএসএফ কর্মকর্তারাও আসেন। সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এমএনএ কর্নেল (অব.) এমএজি ওসমানী সেনা অফিসারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করেন। ১১ই এপ্রিল ভারতের শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা দেন যে, সমস্ত বাংলাদেশকে ৮টি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী বাঙালি সেনারা পশ্চাদপসরণ করে ভারতে প্রবেশ করছিল। ভারতে প্রবেশ করছিল শরণ ও মুক্তিকামী হাজার হাজার মানুষ। এসময় পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষে বিএসএফ তাদের যৎসামান্য সহায়তা দিয়েছিল। ৩০শে এপ্রিল থেকে সহায়তায় এগিয়ে আসে ভারতীয় সেনাবাহিনী। মে মাস থেকে শুরু হয় মুক্তিসংগ্রামে যোগদানেচ্ছুদের প্রশিক্ষণ। ১৯শে মে সামরিক অঞ্চলগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করে প্রবাসী সরকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে।

মুক্তিযুদ্ধে ২নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারের শুরুটা হয়েছিল পশ্চিম ত্রিপুরার মতিনগরে। মতিনগর কুমিল্লা সীমান্তে বিএসএফের ঘাঁটি। এই জায়গাটিকে ২নং সেক্টরের আতুরঘর বলা চলে। সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় পাকিস্তানি আক্রমণের আশঙ্কায় সেক্টর সদর দপ্তরকে ত্রিপুরার আরও ভেতরে মেলাঘরে সরিয়ে নেওয়া হয়। মেলাঘর আগরতলার ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে কুমিল্লা সীমান্ত থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরত্বে। সেক্টরের নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠেছিল চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি সৈন্য ও এ এলাকার ইপিআর সদস্যদের নিয়ে। এ সেক্টরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন ৩৫ হাজার গেরিলা সদস্য। ঢাকায় ঝটিকা অপারেশন পরিচালনাকারী ক্র্যাক প্লাটুন, আরবান গেরিলারা ছিলেন এ সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা। আর গেরিলাদের গুরু ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার। শুরু

থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন খালেদ মোশাররফ আর ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দার। অন্যান্য সেক্টরে প্রশিক্ষণের পুরো এখতিয়ার ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর। এই সেক্টরে ভারতীয় বাহিনীর পাশাপাশি নিজস্ব কায়দায় বিশেষ ট্রেনিং দিতেন হায়দার। মতিনগর-মেলাঘরে দলে দলে ভিড় করা তরুণদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র ও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। এদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত 'স্টুডেন্ট কোম্পানি'। ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার হিসেবে অপারেশনের জন্য ছেলে বাছাই করা, দিনের পর দিন ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা, প্র্যাকটিস করানো এবং নিজ হাতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে দিনরাত কাজে ডুবে থাকতে হতো। হাজার হাজার গেরিলার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র জোগাড়ের জন্য সর্বক্ষণ ছুটে বেড়াতে হতো। জুন মাসে গেরিলাদের প্রথম দলটি ঢাকায় পাঠানো হয়।

তাঁর সহকর্মী ও শিষ্য গেরিলারা স্মৃতিচারণে জানান যে, আচার-ব্যবহারে হায়দার ছিলেন খুবই অমায়িক। সিভিলিয়ানদের কখনও হেয় করতেন না। যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে আপন করে নিতেন সহজেই। ফলে গেরিলারা হায়দারের নেতৃত্ব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। 'শরীরটা ছিল যেন চাবুক আর স্টিলের স্প্রিং দিয়ে তৈরি বান্ডিল মাসল। মেজাজ একদম ঠান্ডা'– বলেছেন একজন সহযোদ্ধা। গেরিলারা তাকে বড়োভাই, অভিভাবক ও বন্ধু মনে করতেন। মৌলিক বহু মানবিক গুণাবলি এরা অর্জন করেছেন হায়দারের কাছ থেকে। হায়দারের স্থান হয়েছে এসব তরুণ গেরিলাযোদ্ধার হৃদয়ের গহীনে।

যুদ্ধ চলাকালেই হায়দার মেজর পদে পদোন্নতি পান। খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স'-এর ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হলে মেজর হায়দার সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। অক্টোবরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ২ নং সেক্টরের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। যুদ্ধে পাকিস্তানিদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেলে মেজর হায়দার ভারতের ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিংকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে মেলাঘর ছাড়েন। ১৬ই ডিসেম্বর সকালবেলায় হায়দার ঢাকায় পৌঁছেন। হায়দার ও সাবেগ সিং মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ দেন। রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে সপ্রতিভভাবে উপস্থিত ছিলেন মেজর হায়দার। নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ মঞ্চে নিয়ে যান জেনারেল অরোরা ও মেজর হায়দার। পরদিন ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর আগেই শাহবাগে রেডিও সেন্টার দখল করে রেডিও চালু করেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দেন। আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

দেশ স্বাধীনের পর হায়দার ফিরে যান ব্যারাকে। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালে পোস্টিং হয় কুমিল্লা সেনানিবাসে। ১৩ ইস্ট বেঙ্গল গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিয়োগ করা হয় কমান্ডিং অফিসার হিসেবে। ১৯৭৪ সালে লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে এটিএম হায়দারকে চট্টগ্রামে অষ্টম বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার বানানো হয়। পরের বছর বদলি করা হয় যশোরে। যশোরে যোগদানের আগেই পোস্টিং দেওয়া হয় বান্দরবানের রুমা সেনা ক্যাম্পে। ২১শে অক্টোবর সেখানে যোগ দেন। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীতে তখন টালমাটাল অবস্থা। পিতার জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে কোনো যানবাহন না পেয়ে মোটর সাইকেলে করে হায়দার ঢাকায় পৌঁছান ৪ঠা নভেম্বর। এসময় দেশে সরকার বলে কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত কাজ সেরে হায়দার সেনানিবাসে যান খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এর আগে ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে ক্যু হয়েছিল। খালেদ ততক্ষণে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান। অস্থিরতার মধ্যে তিনি ছিলেন ক্যান্টনমেন্ট বঙ্গভবনে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে। হায়দার তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সেনাবাহিনীতে খালেদবিরোধী পাল্টা অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে ৬ই নভেম্বর রাতে বঙ্গভবন থেকে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে বেরিয়ে আসেন হায়দার। ধানমন্ডি সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ে তাদের গাড়ি। হায়দার ও ব্রিগেডিয়ার হুদাকে নিয়ে খালেদ মোশাররফ আশ্রয় নেন শেরেবাংলা নগরে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। পরদিন ৭ই নভেম্বর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে বন্দি অবস্থায় নিহত হন কর্নেল এটিএম হায়দার।

মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী লে. কর্নেল হায়দার চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কিশোরগঞ্জ শহরে তাঁদের শোলাকিয়ার বাসার সামনে। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৩ বছর। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বেঁচে আছেন বোন ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম, বীরপ্রতীক ও ভাই মুক্তিযোদ্ধা এটিএম সাফদার (জিতু মিয়া)। বোন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আর ভাই কিশোরগঞ্জ শহরে বসবাস করেন। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় তাঁর বাসার সামনের সড়কটি হায়দারের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও সামরিক ইতিহাসে কিংবদন্তি। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে গেরিলা তৈরির এই মহান কারিগরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থপঞ্জি

১। জহিরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তাঁর বিয়োগান্ত বিদায়, প্রথমা প্রকাশন (২০১৩);
২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, খণ্ড-২, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
৩। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, বাংলাদেশ: রক্তাক্ত অধ্যায় (১৯৭৫-১৯৮১), পালক পাবলিশার্স;
৪। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ (২০১৪), বাংলা একাডেমি;
৫। কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল হক (অব), 'বিনা দোষে হত্যা করা হয়েছিল এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে' যুগান্তর, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২১;
৭। সংগ্রামের নোটবুক-মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ওয়েবসাইট ।

ইয়াকুব আলী: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস অ্যান্ড মিনিস্টিরিয়াল পাবলিসিটি), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ

নাসরীন মুস্তাফা

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম গ্রন্থের লিপিকার শিল্পী আবদুর রউফ ১৯৭১ সালে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তরাজ্যে জনমত গড়ে তুলতে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণ করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের চলচ্চিত্র শাখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল, তেমনিভাবে অধিদপ্তরের চারুকলা শাখার গর্ব হয়ে আছেন শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ। বিজয়ের এই মাসে বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিক এই শিল্পীর জন্মমাস। আর তাই বর্তমানের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে তাঁর অবদান বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি।

১৯৩৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ। ১৯৫২ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রতিষ্ঠিত 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস' (বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট)-এ পড়াকালীন জয়নুল আবেদিনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯)

পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ক্যাডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এ. কে. এম. আবদুর রউফ। ১৯৬৫ সালে প্রথম বাঙালি হিসেবে করাচিতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডনে যান। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯) পাকিস্তান সরকারের কমনওয়েলথ বৃত্তি পেয়ে লন্ডন কলেজ অব প্রিন্টিংয়ে ডিজাইন, প্রিন্টিং ও প্রোডাকশন বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করার জন্য লন্ডনে থাকার সময় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরুতে দেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিরাও দেশের মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। (সোম। ২০১৫। পৃষ্ঠা ৫৬)

শিল্পী আবদুর রউফ পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে লন্ডন থেকে মুজিবনগরে শপথ নেওয়া বাংলাদেশ সরকারের কাছে আনুগত্যের সংবাদ পাঠালে মুজিবনগর থেকে ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল পত্র মারফত তাঁকে বাংলাদেশের আইনসঙ্গত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৬৫)

১৯৭১ সালে মাতৃভূমির স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তরাজ্যে জনমত গড়ে তুলতে পত্রিকা প্রকাশ, লোগো ডিজাইন, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার তৈরি, কার্টুন আঁকাসহ নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এ. কে. এম. আবদুর রউফ। ১৯৭১ সালের ৫ই মার্চ বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। সেখানে শিল্পী রউফের আঁকা ব্যানার-ফেস্টুনে পাকিস্তানের নৃশংসতার প্রতিবাদে বাঙালির ঘৃণা মিশ্রিত প্রতিবাদ ফুটে ওঠে। প্রবাসী বাঙালি, বিদেশি নাগরিক, সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের সাথে এই মিছিলে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমাবেশ শেষে হাই কমিশনের সামনেই পুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানের পতাকা। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৬০) সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানোর এবং শিল্পী হিসেবে তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ে পতাকা তৈরির। এক দিনের ভেতর অনুমানের ওপর নির্ভর করে এবং আলোচনার ভিত্তিতে ছোটো সাইজের একটি নমুনা পতাকা তৈরি করেন তিনি। ৭ই মার্চে লন্ডনের হাইড পার্কে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সেই পতাকা উড়িয়ে উপস্থিত সকলে আন্দোলনের জন্য শপথ নেন। ('বিদেশের মাটিতে যিনি প্রথম পতাকা তৈরি করেছিলেন'। ২৯.০৪.১৯৯৯। *দৈনিক জনকণ্ঠ।*) ২৮শে মার্চ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে কয়েক হাজার বাঙালির এক

বঙ্গবন্ধুর সাথে শিল্পাচার্য এবং শিল্পী আবদুর রউফ

প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার পোস্টার, ব্যানার এবং বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত ব্যাজ তৈরির দায়িত্বও পালন করেন তিনি। শিল্পী রউফের তৈরি করা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাও উত্তোলন করা হয় সেদিন। (সোম। ২০১৫। পৃষ্ঠা ৫৬)

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু ও শিল্পী আবদুর রউফ

২৫শে মার্চের গণহত্যার প্রতিবাদে জেনেভা থেকে লন্ডনে এলেন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২৭শে মার্চ বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মিশনকে কেন্দ্র করে গঠিত লন্ডনভিত্তিক বাংলাদেশ আন্দোলনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করেন শিল্পী আবদুর রউফ। গঠিত হয় বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি। এই কমিটির পক্ষ থেকে *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* নামে একটি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি সম্পূর্ণ হাতে লিখে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৬০, ১৬৫)

প্রবাসে বাঙালিদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতিটি কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন এ. কে. এম. আবদুর রউফ। ১৯৭১-এর জুলাই মাসে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে তাঁকে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার জন্য পত্র মারফত নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে তাঁর বৃত্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ফিরে না গিয়ে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখে রাজনৈতিক আশ্রয় চান। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। ২৭শে আগস্ট লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের উদ্‌বোধন করেন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী। মিশনে সেকেন্ড সেক্রেটারি পদে যোগদান করেছিলেন শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ। (সোম। ২০১৫। পৃষ্ঠা ৫৭)

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে পৌঁছালে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর রেজাউল করিমের সাথে থেকে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান ডেপুটি ডাইরেক্টর আবদুর রউফ। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে লন্ডন শহরের দিকে পথে গাড়িতে রেজাউল করিমের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু প্রথম শুনলেন– বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম। (তোফায়েল। ১৯৯১। পৃষ্ঠা ৯৮) বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি সদস্যদের চাঁদা সংগ্রহ করে ফান্ড গঠন করে, যার সমুদয় অর্থ বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের হাতে জমা দেয়। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৬০)

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম গ্রন্থের লিপিকার শিল্পী আবদুর রউফ। তাঁর হাতের লেখার প্রসিদ্ধি এত ছিল যে, লন্ডন থেকে কয়েক মাসের জন্য ডেকে এনে তাঁকে দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের পুরোটা হাতে লিখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ('৭১-এর আমরা ক'জনা। ১৪.০৭.১৯৯৩। *দৈনিক সংবাদ)*

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁকে সংবিধান লেখার কাজে লাগাতে ভূমিকা রেখেছিলেন। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ঢাকা থেকে লন্ডনে টেলিফোন করে আবদুর রউফকে জানান যে, বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ডেকেছেন। স্বল্প সময়ের নোটিশে তিনি ঢাকায় এলেন ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে। গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব তাঁকে দেন। হাতে লেখা হলে ড. আনিসুজ্জামান এবং নেয়ামাল বাসির ভুলভ্রান্তি দেখে দিতেন। একটি অক্ষর ভুলের কারণে কোনো কোনো পৃষ্ঠা দুই-তিনবারও লিখতে হয়েছে। লিখিত কোনো প্যারা বাদ বা সংশোধন করা হলে সেই পৃষ্ঠা তো লিখতে হতোই, পরের পাতাগুলো আবার নতুন করে লিখতে হতো। (অনন্য এক শিল্পকর্ম। ১০.১১.২০০৬। *প্রথম আলো*)

১৯৭২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্পী আবদুর রউফসহ শিল্পীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে সংবিধান গ্রন্থ তুলে দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। (Bangabandhu overwhelmed with Joy. ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২। *The Bangladesh Observer*)

আধুনিক যন্ত্রকে হার মানিয়ে দেওয়া শিল্পী আবদুর রউফের হাতের লেখা সংবিধানের ১০৯ পৃষ্ঠার প্রতিটি হরফ একই রকম, একই মাপের। জাতীয় সংসদে সংবিধান পাস করার পর ঐ সংসদে বসে তৎকালীন সকল সংসদ সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এ. কে. এম. আবদুর রউফ। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৬০) সংবিধানের বিবরণ ৯৩ পৃষ্ঠায় এসে শেষ করা হয়। এই পৃষ্ঠায় শিল্পী আবদুর রউফের হাতে লেখা ছয়টি বাক্যের নীচে বাংলাদেশ গণপরিষদের সদস্যদের স্বাক্ষর আছে। প্রথমেই স্বাক্ষর করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ৩৯৯ সদস্যের স্বাক্ষরে ব্যয় করা হয় ১৬টি পৃষ্ঠা। সর্বশেষ পৃষ্ঠায় আছে শিল্পীরা কে কী করেছেন, সেই বিবরণ। সেখানে লিপিকার হিসেবে আছে এ. কে. এম. আবদুর রউফের নাম। বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত এই সংবিধান গ্রন্থটি বর্তমানে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে। (অনন্য এক শিল্পকর্ম। ১০.১১.২০০৬। *প্রথম আলো*)

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে দেশে ফেরার প্রাক্কালে ১৯৭৫ সালের ৭ই মে হিথরো বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

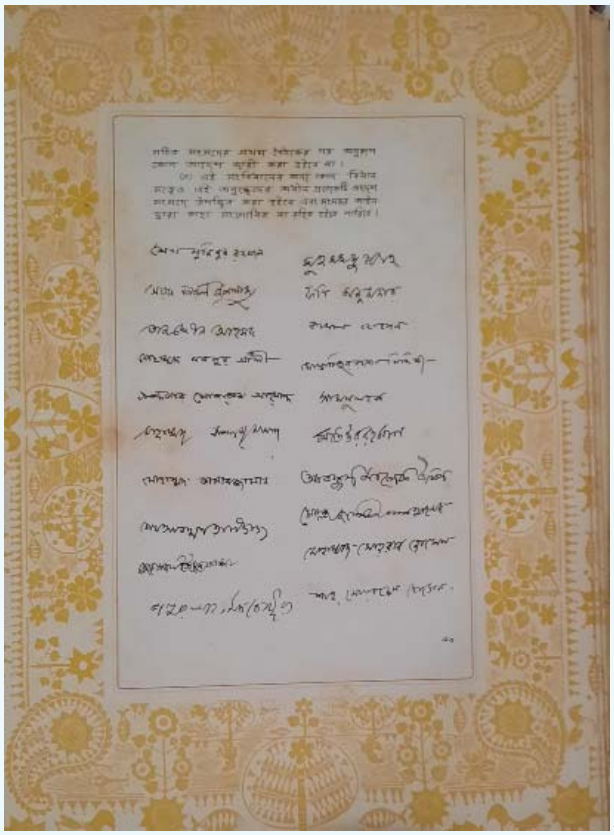

শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদায় জানানোর সময় নিজের হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি উপহার দেন বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎকালীন কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশন সেক্রেটারি আবদুর রউফ। (*The Bangladesh Observer*. 23.05.1975)

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক 'বলাকা' অঙ্কন করেন তিনি এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিমানের লন্ডন-ঢাকা রুটের শুভ সূচনায় অংশ নেন। ইউনেসকোসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম কিউরেটর ছিলেন শিল্পী আবদুর রউফ। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৬০)

শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর উদ্ভাবিত বাংলা টাইপ রাইটারের কীবোর্ড পুনর্বিন্যাস করেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এবং শিল্পী আবদুর রউফ। (বাংলা একাডেমির মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্তির পথে। ১০.৮.১৯৮৮। *দৈনিক সংবাদ*)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিল্পী আবদুর রউফের চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে, এসবের উচ্চমান বিবেচনা করে থেম অ্যান্ড বেকার প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট এনসাইক্লোপিডিয়াতে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছে। লন্ডনে আন্তর্জাতিক চিত্রকলা প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা 'যুদ্ধ নয় শান্তি' ছবিটি লন্ডনের রানিমাতা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। (বারি। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা ১৫৯)

২০০০ সালের ১লা এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবময় অবদান রাখা জীবনধর্মী শিল্পী এ. কে. এম. আবদুর রউফ। চিত্রকলায় অবদানের জন্য ২০১০ সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক এবং ২০১৬ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার।

তথ্যসূত্র

১। এম. এ. বারি। ১৯৯৬। *মুক্তিযুদ্ধের রক্তিম স্মৃতি: Memoirs of Blood Birth.* সীমিত সংগ্রাহক সংস্করণ। বাণীমহল প্রকাশনী। ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৫৯, ১৬০, ১৬৫। (শিল্পীপুত্র রিয়াদ রউফের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

২। তোফায়েল। ১৯৯১। *বাঙ্ময় বাঙ্গালী*। পাঁচগাঁও প্রকাশনী। ঢাকা। পৃষ্ঠা ৯৮।

৩। '৭১-এর আমরা ক'জনা। মহিউদ্দিন আহমদ। ১৪ই জুলাই ১৯৯৩। *দৈনিক সংবাদ।*

৪। Bangabandhu overwhelmed with Joy. ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২। *The Bangladesh Observer.*

৫। ২৩শে মে ১৯৭৫। *The Bangladesh Observer.*

৬। বাংলা একাডেমির মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্তির পথে। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্। ১০ই আগস্ট ১৯৮৮। *দৈনিক সংবাদ।*

৭। অনন্য এক শিল্পকর্ম। মোহাম্মদ আসাদ। ১০ই নভেম্বর ২০০৬। *দৈনিক প্রথম আলো।*

৮। বীরেন সোম। ২০১৫। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী সমাজ।* প্রথম সংস্করণ। চন্দ্রাবতী একাডেমি। পৃষ্ঠা ৫৬, ৫৭।

নাসরীন মুস্তাফা : সাহিত্যিক

২২তম ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত

২২তম ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ কাতারে শুরু হয়েছে। ফুটবল বিশ্বকাপের এই রোমাঞ্চকর মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে ডাক অধিদপ্তর দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, ত্রিশ টাকা মূল্যমানের একটি স্যুভেনির শিট, দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত ও পাঁচ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড এবং একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ২২শে নভেম্বর বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট ও উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ডাটা কার্ড ও বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা আখ্যায়িত করে বলেন, শুধু শখের বসেই এই খেলাটি খেলা হতো, যা আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে ১৮৭২ সালে। গ্লাসকোতে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। একটা সময় ফুটবলের গণ্ডি ছিল শুধুই অলিম্পিক। তবে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন এভাবে বাড়তে থাকল যে সংস্থা অলিম্পিকের বাইরেও একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা চিন্তা করে। সেই লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে আয়োজন করা হয় একটি প্রতিযোগিতার। তার দুবছর পরই ১৯০৮ সালে লন্ডনে, গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু। কাতারই মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম কোনো দেশ যারা আয়োজন করছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

অনন্ত পথ যেন দ্রৌপদীর শাড়ি

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

আজ নিশ্চয়ই বিশেষ একটি দিন। যাত্রাপথে আজকের যে-কোনো এক সময়ে পাকিস্তানের বর্ডার পার হব আমরা। যতই ক্লান্তি নামুক না কেন শরীরে, বুকের ভেতরে এক থ্রিল অনুভব করছি। শিহরিত হচ্ছি বার বার। যতই বেলা বাড়ছে ততই অস্বস্তি বাড়ছে। পাঠান দুজন গাইডের দেখা নেই। এখনও আমরা পাকিস্তানের সীমানার ভেতরে আছি, যে-কোনো মুহূর্তে ধরা পড়তে পারি, সে ভয় এখনও রয়েছে।

বেলা বাড়ছে। সকালের মিষ্টি রোদে ঝাঁঝ মিশেছে। প্রাক দুপুরে এই পাহাড়ি এলাকায় বসে হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। এমন সময় দেখি হুড়মুড় করে দুজন পাঠান আসছে। ল্যান্ড রোভার গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার ছাড়াও যথারীতি দুজন পাঠান গাইড রয়েছে সঙ্গে। আবার যাত্রা শুরু।

গাড়িতে উঠার পর ড্রাইভারের সঙ্গী দুজন বলে, বিপজ্জনক পথ শেষ হয়েছে, এবার আর তোমাদের কোনো ভয় নেই।

সত্যি গাড়িতে বসে সবাই স্বস্তি পাই। তাছাড়া বিপদ কেটে গেছে জেনে স্বাভাবিক হয়ে আসে মন।

শেষ দুপুরের ঝকমকে রোদে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকে ল্যান্ড রোভার। পেছনে রাস্তা যত ফেলে যাচ্ছি ততই ভাবছি নিজের দেশ

কাছে– আরও কাছে চলে আসছে। এত অনিশ্চিত এই পথযাত্রা তবু মিষ্টি-মধুর ভাবনায় মন বিভোর হয়ে থাকে।

গাড়ি ছুটছে ঠিক ধনুকের ছিলা থেকে ছুটে আসা তীরের মতো। দুপাশে ধু-ধু মাঠ, দলে দলে Smuggler কাফেলার মতো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার ও ওর সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে পশতু ভাষায় কী যেন আলোচনা করল। কথা বলে বেশ হাসাহাসি করে ওরা।

কী ব্যাপার? আরে কী ব্যাপার? ক্যায়া হুয়া ভাই? কোই বাত তো জরুর হে। ওরা হাসতে হাসতে বলে, মজা দেখেগা তুমলোগ?

ওদের হাসিমুখ দেখে বুকে বেশ ভরসা পাই। নিশ্চয়ই কোনো সিরিয়াস ব্যাপার নয়।

সবাই বললাম, জরুর জরুর।

তো দেখো।

ড্রাইভার একটানা হর্ন বাজাতে থাকে ভীষণ জোরে জোরে। চোরাকারবারির দল সাইকেল আর গাধার মুখ ঘুরিয়ে নিতে থাকে। ভাবছে মিলিশিয়া এসেছে। যে যার মতো এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছে। সত্যি– হাসির ব্যাপারই বটে।

বহুদিন পর ওদের ছুটোছুটি দেখে পলকের জন্য প্রাণভরে হাসতে থাকি। গাড়ি পঙ্খিরাজ ঘোড়ার মতো ছুটছে। ড্রাইভার আর ওর দুজন সাথি হৈ হৈ করে ওঠে।

রোদ ঝলোমলো মধ্য দুপুর। এক সময় ড্রাইভার জোরেসোরে বলল, আ গ্যায়া। তাকিয়ে দ্যাখো এই তো চমন। আভি তোমলোগ পাকিস্তান কা বর্ডার পার হো যায়েগা।

চমনের আঙুর বেশ বড়ো ও কালচে রঙের হয়। রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে চমন জায়গাটিকে দেখতে থাকি। বুকের ভেতর আনন্দে-কষ্টে-খুশি ও কান্নার ঢেউ খেলে যায়।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভাষায়– আমরা ছিলাম 'জিম্মি'। এতদিন পর পাকিস্তানের বৃত্ত থেকে বের হতে যাচ্ছি।

বিদায় পাকিস্তান, গুডবাই করাচি। চিরদিনের মতো তোমাদের ছেড়ে এলাম। কোনোদিনও তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না। নাজিমাবাদের ঘন সবুজ লন, চাম্বেলী আর রাত কি রানির সুবাস চাঁদভরা রাতকে ভরিয়ে তুলবে। শুধু আমি থাকব না। গুডবাই পাকিস্তান। কেউ যেন কানে কানে গাইল–

'কভি আলবিদা না কেহনা'। দুচোখ আমার ভিজে যেতে থাকে।

বিকেলের দিকে বিশাল এক বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামে। পরে জেনেছি জায়গাটি Tribal Chief-এর শাসনাধীন নোম্যানসল্যান্ড। এটি আফগানিস্তানেরও নয়, পাকিস্তানেরও নয়।

রইসানী সাহেবের নির্দেশেই এ বাড়িতে রাত কাটাব, পরদিন ভোরে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে।

বিশাল একটি হলরুমে আমাদের তিনটি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পুরো রুমজুড়ে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট পাতা। বেশ কটি তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে। সারাদিনের পর ক্লান্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছি। সব কিছু অদ্ভুত লাগছে আমার। পথে পথেই দিন কেটে যাচ্ছে ঠিক মুসাফিরের মতো। নতুন নতুন পরিবেশের মুখোমুখি হচ্ছি রোজ।

বাইরের খোলা মাঠে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা খেলছে। খেলার উপকরণ ডাংগুলি নয়, গুলতি নয়– হাতে হাতে ছুরি। আমি তো একেবারে হতবাক, আমাদের এসব দেখে অভ্যেস নেই, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে– হয়ত এক্ষুণি হাত ফসকে কারোর হাতে-পায়ে-বুকে ছুরি বসে যাবে, রক্তে ভিজে যাবে মাটি। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! আমার সার্বক্ষণিক ভয়কে মিথ্যে করে দিয়ে ওরা নিপুণভাবে ছুরি ঘোরাচ্ছে, লুফে নিচ্ছে এ হাত থেকে ও হাতে। হাতের গ্রিপ কী চমৎকার! কত না কৌশলে ওরা খেলছে– দেখে দুচোখের পাতা আর পড়ে না। ছুরি যে কচি শিশুদের খেলার উপকরণ হতে পারে নোম্যানসল্যান্ডে না এলে জানতেও পারতাম না। ছুরি হলো ওদের খেলনা।

অবশ্য নোম্যানসল্যান্ডে আইনকানুন কিছু নেই। বন্দুক-গুলি-ছুরি দিয়ে খেলা করা কোনো অপরাধ নয়। এসব ভেবে মনে মনে শিউরে উঠলেও বাইরে স্বাভাবিক থাকি। অনেক কিছুই আমার অপছন্দ হতে পারে তাই বলে তো পৃথিবীর কোনো কিছু যায় আসে না।

যাহোক Tribal chief-এর বাড়িতে রাত কাটাব আমরা। বাড়িটি হাজী সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত।

সেই ভোরে তাড়াহুড়ো করে হোটেল থেকে বেরিয়েছি। সারাদিনের পথশ্রম, জলের জন্য আহাজারি, চলার পথে জোরদার পাহারার আতঙ্ক–সব মিলিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করি। শরীর যেন আর বইছে না। তবে ধুলোয় মাখামাখি জামাকাপড় ছেড়ে বোরখা খুলে, হাতে-মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারলে কিছুটা ভালো লাগত।

বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এসে জানিয়ে দিয়ে গেল বাড়ির ভেতর যেতে।

পানি চাহিয়ে? তো আওরাত লোগ সব অন্দর মে আও।

মেয়েরা বাড়ির ভেতরের দিকে পা বাড়ালাম। চারপাশে যত তাকাই তত অবাক হয়ে যাই। বিরাট এলাকাজুড়ে বাড়ি। এক জায়গায় জল রাখা হয়েছে 'মশক'-এর ভেতরে।

জল রাখার আধারকে ওরা মশক বলে। ভেড়া কিংবা খাসির ভেতরটা খালি করে, সোজা কথায় মাংস বের করে নিলে চামড়া ঠিক থলের মতো হয়ে যায়। এতে জল রাখলে তা সোরাই বা কুঁজোর মতো ঠাণ্ডা থাকে। মশক বা ভিস্তি থেকে জল নিতে হবে আমাদের।

হাত-পা ধুলোমাখা, জলের ব্যবস্থা দেখে মনটা ভরে গেল। ঠান্ডা জলে এবার ধুয়ে মুছে নিতে পারব সারাদিনের সব ক্লান্তি– এ কথা ভাবতেই মনটা নিমেষে ভালো হয়ে গেল। Tribal chief-এর বেগম আচমকা জিজ্ঞেস করেন, তুমলোগ সব মুসলমান তো হ্যায়?

সবাই সমস্বরে বলল, জি হ্যাঁ।

গম্ভীর মুখে বেগম বলেন, তো কলেমা পড়হো।

আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। হাজী সাহেবের বেগমের এ যেন নির্দেশ নয়, আমার জন্য Verdict।

সঙ্গী মেয়েরা একেকজন করে কলেমা পড়ছে, এরপর জল নিচ্ছে।

প্রথমে ভেবেছি, আমাদের দলে একজন কলেমা পড়লেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে। এবার দেখি তা নয়, জল নেবার আগে প্রত্যেককে কলেমা পড়তে হবে। সঙ্গী মেয়েদের ভাবনা শুধু আমার জন্য– এ কঠিন বৈতরণি আমি পার হব কী করে?

সবার শরীর বোরখা দিয়ে ঢাকা, মুখের উপরে নেকাব। নিশ্চয়ই হাজী সাহেবের বেগম কিছু সন্দেহ করেছেন, তাই তিনি কলেমা পড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

বহুদিন থেকে ভয়ের মাঝে বসবাস করতে করতে মনটা সারাক্ষণ কারণে-অকারণে দুরু দুরু কাঁপে। একদার প্রতিবাদী মেয়েটি আজ ভীষণ ভীরু।

মিনিট কয়েকের ব্যাপার। সঙ্গী মেয়েরা সত্যি সত্যি মুসলমান কি না তা যাচাই করা শেষ হয়েছে। পরীক্ষায় ওরা উত্তীর্ণ। এবার আমার পালা। নতুন এই পরীক্ষায় মুখোমুখি হয়ে আমি যেন জীবন-মরণের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি। বেগমের নির্দেশ আমার কাছে মৃত্যুর পরওয়ানা।

লেসের নেকাব তুলে আমি, আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাজী সাহেবের বেগম। ক্লাস সেভেন-এইটে সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে হয়েছে। একটি গল্পের শেষ শিক্ষাবাণী এরকম ছিল–

'যতক্ষণ না ভয় আসে ততক্ষণ ভয়কে ভয় করিবে। ভয় সামনে এসে দাঁড়ালে এর যথাযথ প্রতিকার করিবে'।

বুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা হৃৎপিণ্ড লাবডুপ লাবডুপ করছে। বেগম গম্ভীর গলায় আদেশ করেন– পড়হো, জলদি কলেমা পড়হো।

নিজেকে সেই মুহূর্তে কীভাবে স্বাভাবিক রেখেছি– এখনও জানি না– তবে সহজ গলায় বলতে পারি– মায় আভি কলেমা নেহি পড় সকতি।

বেগম আশ্চর্য তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন রাখেন, কিউ?

বহুদূর থেকে সফর করে এসেছি, মেরি কাপড়া পাক-সাফ নেহি হ্যায়। ওজু ভি নেহি হ্যায়, ইসি লিয়ে ম্যয় আভি কলেমা নেহি পড় সকতি।

দুঃশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে বেশ কিছুদিন থেকে কাতর ছিলাম। দুস্তর পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত-শ্রান্ত। কী করে যে সাহসী ও যথাযথ কথা বলতে পেরেছি তা আজও আমার বোধগম্য নয়। নয়তো সবই পরমেশ্বরের কৃপা। তিনিই আমাকে মমতাভরা দুহাত দিয়ে এ কঠিন পরীক্ষা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

'বাঁচিয়ে দিলেন'– এ দুটি শব্দ বললাম এ কারণে যে, তাৎক্ষণিকভাবে উপজাতি সর্দারের বেগম খুশিভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠেন।

আরে তো ইয়ে বাত হে?

আবেগে-ভালোবাসায় তিনি দুহাত বাড়িয়ে দেন।

ইয়ে তো সাচ্চা মুসলমানকে লাড়কি হে।

পিঠে আদুরে চাপড় দিয়ে বলেন, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়– পানি লে লও। ভিস্তি থেকে শীতল জল নিতে আর কোনো বাধা রইল না। হাত-মুখ ধুয়ে বিশাল সেই হলরুমে ফিরে আসতে আসতে অনুভব করলাম– আমার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে।

সঙ্গীরা বলতে থাকেন, আপনার জন্যই আমাদের ভাবনা ছিল বৌদি। এবার আর কোনো ভয় নেই। সর্দারের বিবিজি আপনার জবাবে দারুণ খুশি।

ধীরে ধীরে বিকেলের সোনা রোদ ফুরিয়ে এল। আসন্ন সন্ধ্যার ধুপছায়া চাদর ঢেকে দিচ্ছে চারদিক। নতুন এই পরিবেশে ছমছম করে ওঠে সারা শরীর।

সব কটি পরিবার টিলার ওপর বিশাল বাড়ির হলরুমে রাত কাটাতে একেবারে রাজি নন। সবাই ভাবছে, কোনো রকমে কান্দাহার যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

তবে মানুষের পছন্দমতো সব সময় তো আর ইচ্ছে পূরণ হয় না, অচেনা এই জায়গায় রাত কাটানোর মতো নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ জায়গা কে আমাদের দেবে?

তাছাড়া হাজী সাহেবের সাথে রইসানী সাহেবের গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে এ আস্তানা ঠিক হয়েছে। মানুষের মুখ মনের আয়না– এও ঠিক। বাড়ির মালিক হাজী সাহেব হয়ত মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছুটা আঁচ পেয়ে থাকতে পারেন।

উনি বললেন, এ সময় কোথায় যাবে তোমরা? ইসি ওয়াক্ত মে আপ লোগো কা যানা ঠিক নেহি হোগা, তোমাদের সামান আসুক, তখন যাবার কথা ভাববে।

হ্যাঁ, মালপত্রের দরকার তো রয়েছেই। সবার সাথে দু'একটি সুটকেস ও ব্যাগ। কাপড়চোপড়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও ওষুধ ছাড়া তো কিছুই নেই। সবাই সবকিছু ফেলে এসেছি কোয়েটার হোটেলে।

বুক ভেঙে করুণ নিশ্বাস ফেলি। তবে সব দ্বিধা কেটে যায় হাজী সাহেবের সহৃদয় ব্যবহারে।

নামছে গাঢ় সন্ধ্যা। অচেনা জায়গায় নতুন এক সন্ধ্যা দেখতে দেখতে মন উদাস হয়ে যায়। রুক্ষ মরুপ্রান্তরে আঁধার অন্য রকম ছায়া ফেলার সাথে সাথে শীতল হয়ে আসে চারদিক। নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে অকারণেই বুকের ভেতরটা বেদনায় ভরে যেতে থাকে।

যাহোক, পেটে তো আর পাথর বেঁধে থাকা যায় না। এবার রাতের খাবারের ভাবনা। আশ্রয় জুটে গেছে, কিন্তু খাবার কোথায় পাব?

এবার পুরুষ মানুষরা খাবার খুঁজতে বের হলেন। কোথায় কী পাওয়া যায় কিছুই তো জানা নেই। যা কিছু পাওয়া যাবে তাই সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খেয়ে নেব।

কিছুক্ষণ পর সবাই মন খারাপ করা মুড নিয়ে ফিরে এলেন। কাবুলি রুটি আর গোশত ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি।

ভীষণ মোটা রুটি। এত দুঃখেও বলি, এ কী তোষক না জাজিম রুটি?

ভীষণ মোটা রুটি ও কালচে রঙের মাংস। ভাবিরা বললেন, এ তো মোষের মাংস।

আমরা মাংস এমনিতেই কম খাই। শাকসবজি ও মাছ খুব পছন্দ করি। রুটি না হয় চিবিয়ে খেতে পারি কিন্তু সঙ্গে তো কিছু একটা চাই। বাচ্চাদের জন্য দুধ লাগবে।

মোস্তাকিনকে টাকা দিয়ে বলি, যেখান থেকেই হোক সের খানেক দুধ নিয়ে এসো।

ভাই ও ভাবিরা মোটা রুটি, বিস্বাদ ও শক্ত মাংস তেমন খেতে পারলেন না। তবে যাহোক কিছু তো পেটে পড়ল। নয়তো উপোস দিতে হতো। অনেকক্ষণ পর মোস্তাকিন ফিরে এল দুধ নিয়ে। বাচ্চারা খেল, বাকি দুধ ও অল্প রুটি দিয়ে ডিনার সারলাম।

আকাশে চুমকির মতো অজস্র তারা, হাসছে চাঁদের খেয়া।

শুক্লপক্ষের এই কোমল রাত, চাঁদ-তারার স্নিগ্ধ আলোও আমার মনের বিষণ্নতা মুছিয়ে দিতে পারে না। সামনে অনন্ত পথ। পরদিন সকালে আবার পথযাত্রা। আগামীকাল আফগানিস্তান পৌঁছাব। প্রথমে কান্দাহার এরপর কাবুলে স্থিতি নেওয়া।

চোখভরা দেশে ফেরার স্বপ্ন, বুকভরা আশা-ভরসা, স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে নতুন করে শুভদৃষ্টি হবে। আরও অনেকটা পথ বাকি। সুদীর্ঘ এ পথ পাড়ি দিতে পারব তো? অবিরত ক্লান্তি নামবে না তো শরীর-মনে?

একরাশ স্বপ্নে বুকের ভেতর আবেগ আর ভালোবাসায় প্রশ্ন জাগে। সত্যিই কি বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারব?

নতুন জায়গা, কিছুতেই ঘুম আসে না। কার্পেটের উপর ধোয়া চাদর আর তাকিয়া দিয়ে পরিপাটি জায়গা করা আছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে রাত কেটে যায়। মাথার ভেতরে মৌরিদানার মতো অজস্র ভাবনা। সকাল হলেই আবার যাত্রা শুরু।

ভোর হতে না হতেই বিছানা ছেড়ে আবার গোছগাছ শুরু করি সবাই মিলে। টুথপেস্ট-ব্রাশ, টাওয়েল এমনই সব দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিটব্যাগে গুছিয়ে নিই। তৈরি হয়ে বসে থাকি। স্থানীয় পাঠান দুজন সফরসঙ্গী হিসেবে কান্দাহার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে।

কান্দাহারের পথে যাত্রা

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে আচমকা নামে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। রোদেপোড়া খরা জায়গায় বৃষ্টি এসে মনে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। ঠাম্মার কাছে ছোটোবেলায় শুনেছি, এমন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি খুব শুভ লক্ষণ। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না জানি না, তবে মন বলল, বড়োরা তো এমনি এমনি কিছু বলেন না, হয়ত শুভ লক্ষণই হবে।

পাকিস্তানের বর্ডার পার হয়ে এসেছি– এত মঙ্গলজনক ব্যাপার। মনে মনে কে যেন জানালো, আর ভয় নেই।

করাচির নাজিমাবাদের বাসা ছেড়ে আসার সময় ট্যাক্সিতে উঠেই বোরখা পরে নিয়েছিলাম। তারপর থেকে এটি ছায়াসঙ্গীর মতো রয়েছে। এবারে এক ঝটকায় সবাই বোরখা খুলে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এমনিতেই এটি পরার অভ্যেস নেই কারোর, তাছাড়া আমাদের নেকাব পরা চেহারা দেখে অবাঙালি লোকেরা যেন বুঝতে না পারে আমরা বাঙালি অওরাত- এজন্যই এটি পরার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। এবার আমরা পাকিস্তানের বৃত্ত থেকে বের হয়ে এসেছি, এখন মুখ ঢাকার জন্য নেকাবের আর দরকার নেই। মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা শব্দ দুটি সারা শরীরে যেন ম্যাজিক স্টিকের মতো বার বার ছুঁয়ে যায়। অপূর্ব শিহরণ আর পুলকে পলকে পলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। ঘর ছেড়ে আসার ক্লান্তি-কষ্ট-ব্যথা কর্পূরের মতো উবে গেছে।

কান্দাহারে যাবার বাসে বসে দারুণ লাগল। এত চমৎকার বসার আসন মনে হয় প্লেনে বসে আছি। বাস ছুটছে। কী আনন্দ চারপাশে। রবীন্দ্রনাথের 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি'–গানটি গুনগুন করতে থাকি। আসলেই এ আমাদের ছুটির আনন্দ।

কোয়েটা থেকে পাকিস্তানের সীমানা পার হওয়া, নোম্যানসল্যান্ডে যাওয়া অবধি আমাদের Escort করেছে অতিকায় পাঠানরা। দেখতে ওরা গালিভারের মতো। মানুষ যেন নয়, ঠিক দত্যি-দানব, বাঙালি পরিবারের সদস্যরা ওদের কাছে তো নস্যি।

আজ সবকিছু একেবারেই অন্য রকম। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, বাদলা হাওয়া, ধুপছায়া রং দিন। মনে আনন্দ টইটম্বুর হয়ে উথলে উঠছে। এক সময় বাস এসে কান্দাহারের 'মে ফেয়ার' হোটেলের সামনে থামে। তখন শেষ দুপুর। অপরাহ্নের এ সময়টুকু ঘড়ির কাঁটা দেখে বুঝতে পারি। নয়তো বাদলা দিনে সময় বোঝা বড়ো ভার।

চারপাশে ট্যুরিস্টদের ভিড়, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করছে। ফেলে আসা যুদ্ধকালীন রুদ্ধশ্বাস দিন, ব্ল্যাক আউটের রাত, বোমা বর্ষণের কান ফাটানো গুম গুম আওয়াজ–সব কিছু দূরাগত স্বপ্নের মতো মনে হয়। এই মুহূর্তে মনে হয় জীবন ভারি সুন্দর।

'মে ফেয়ার' হোটেলে আমাদের বরাদ্দ কামরাতে ঢুকে মনটি ভরে গেল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাই বসি। অনেকদিন পর এ আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। বাইরে বেশ ঠান্ডা, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই, থামার কোনো নাম নেই। তবু স্নান করতে বড্ড ইচ্ছে হলো।

সাজানো বাথরুমে ঢুকে মন ভরে গেল। ট্যুরিস্টরা আসা-যাওয়া করে বলেই সব কিছুই সাজানো গোছানো। স্নান করে পোশাক পালটে ডাইনিং হলে ঢুকি। সবাই নিরুদ্বেগ, ভয়-ভাবনা-উৎকণ্ঠা কিছু নেই বলে সবার হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখ। বিষণ্নতার প্রলেপ একেবারেই মুছে গেছে। কে কী অর্ডার দেব খুব মনোযোগ দিয়ে তাই মেন্যুকার্ড দেখছি। আমি ভেজিটেবল ও চিকেনের অর্ডার দিলাম। স্মার্ট ওয়েটাররা টেবিলে টেবিলে নিপুণ হাতে সার্ভ করছে খাবার। আমাদের টেবিলে এল ভেজিটেবল ও চিকেন কারি, সাথে বাসমতী চালের ভাত ও রুটি। সবই ভালো কিন্তু ভেজিটেবল দেখে অবাক হতে হলো। বড়ো বড়ো টুকরো করা আলু হলুদ-নুন ছাড়া জলে সেদ্ধ করলে যেমন হয় তেমনই। স্বাদহীন বিবর্ণ এক কারি। যাহোক আমরা চিকেন কারি দিয়ে পেট ভরে ভাত খেলাম। অনেকদিন পর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি, তাই মনও ভরে আছে।

আশ্বিনের শিউলি ঝরা ভোর, শ্রাবণ-সন্ধ্যার অঝোর বর্ষণ, ফাল্গুনের বাউল বাতাস, খর বৈশাখের ঝিমধরা দুপুর দেখলে বুকের ভেতরটা যেমন অপূর্ব এক ভালোলাগায় ভরে যায়– কান্দাহারের সেই কমলালেবু রং বিকেলে, সেই জমজমাট সন্ধ্যা ও গাঢ় রাতের প্রতিটি মুহূর্তে সে রকম এক ভালোবাসার আবেশে মন ভরে গেল। কিছুটা সময় ঘুমিয়েছি, কিছু সময় জেগেও থেকেছি– নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, নতুন বিছানা তাই হয়ত। তবে এই আধো ঘুম আর আধো জাগরণের সময়টুকুও কম আনন্দের নয়। বার বার মনে একটি কথাই ঘুরে ফিরে আসে– আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন। আমরা আর পাকিস্তানের জিম্মি নই। পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

স্বাধীন দেশটির নাগরিক আমি– একথা ভেবে মন আমার আনন্দে ভরে যেতে থাকে।

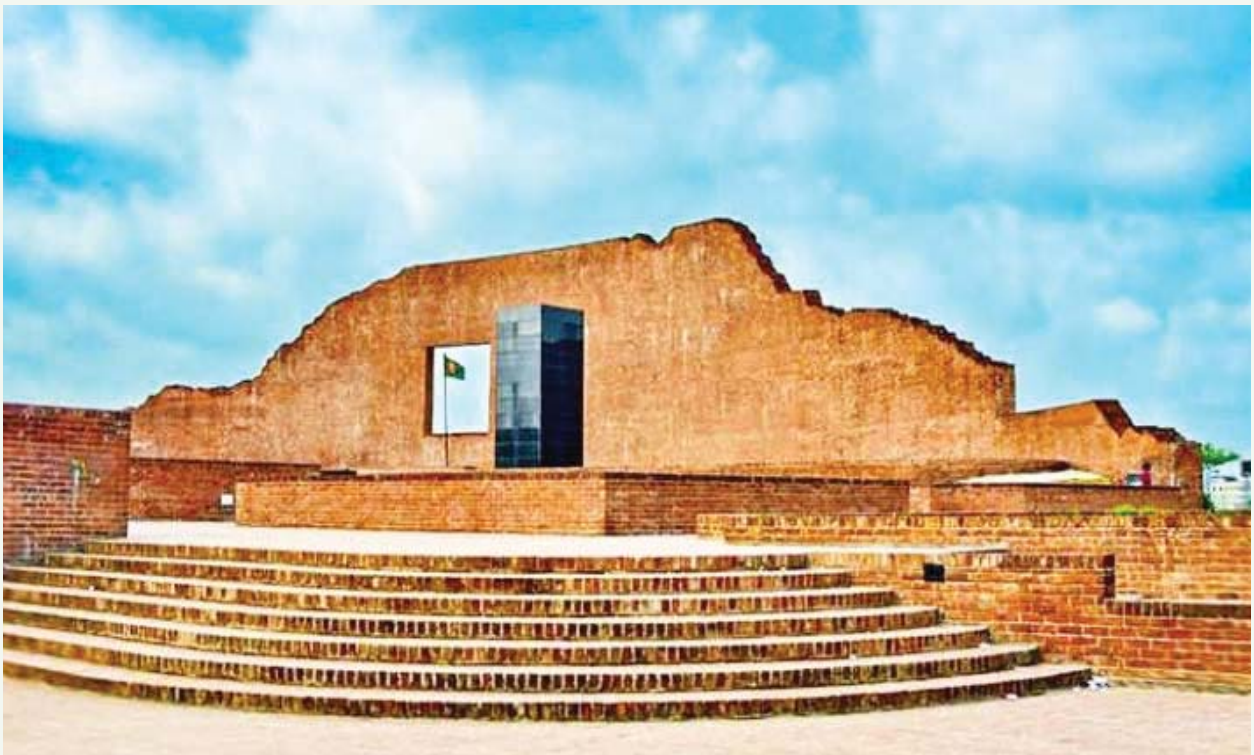

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও জাতির আলোকবর্তিকা

মুহা. শিপলু জামান

১৪ই ডিসেম্বর দিনটি বাঙালি জাতির জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় যখন ছিল মাত্র সময়ের ব্যাপার, তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর, রাজাকার, আলবদর, আলশামস নির্মমভাবে হত্যা করে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ বহু জ্ঞানী-গুণীজনকে। দিনটিকে আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে স্মরণ ও পালন করে থাকি। বছরজুড়ে স্মরণ করলেও এই বিশেষ দিনে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই জাতির সূর্যসন্তান সকল বুদ্ধিজীবীকে যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের মেধা, প্রজ্ঞা ও অসীম সাহস নিয়ে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ষুরধার লেখনী ও মানব সেবার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, তরান্বিত করেছিলেন বাংলাদেশের বিজয় অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারকে বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ প্রদান করে, মুক্তিযুদ্ধকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন নানান গুণে আলোকিত বুদ্ধিজীবীগণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় ক্রান্তিলগ্নে তাঁরা ছিলেন আমাদের আলোকবর্তিকা।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালের ১৯শে নভেম্বর একটি ১১ সদস্যের যাচাই বাছাই কমিটি গঠন করে। কমিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত। অনেক আলোচনার পর ২০২১ সালের ২৯শে এপ্রিল কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, যেসব বাঙালি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, রাজনীতিক, সমাজসেবী, সংস্কৃতিকর্মী, চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত ও শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে শহিদ কিংবা চিরতরে নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁরা শহিদ বুদ্ধিজীবী। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সারা দেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার সময়কাল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর হলেও ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে এ সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১শে জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার সম্পদ লুট করেছে। এদেশের জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ, দমনপীড়ন ও নির্যাতন করেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর মানুষসহ অনেক জ্ঞানী-গুণীজনকে। বাঙালিদের অসীম সাহস, ধৈর্য আর ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় মনোবলের কাছে তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে, হায়েনার মতো খুঁজে খুঁজে হত্যা করে বাংলাদেশের আলোকিত মানুষদের। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য ও পঙ্গু করাই ছিল তাদের ঘৃণিত উদ্দেশ্য। বাঙালি যেন বিশ্বসভায় কোনোদিন শিক্ষা ও মননে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিংবা সংস্কৃতিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এটাই ছিল তাদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। সেদিন তারা বেছে বেছে

আমাদের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক, শিল্পী ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অগণিত গুণীজনকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়, তাঁদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায় এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। ঢাকার রায়ের বাজার, মিরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে অগণিত মানুষের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ও দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞে সেদিন বিশ্ব হয়েছিল স্তম্ভিত ও হতবাক। ঘাতকরা এতটাই নৃশংস ছিল যে তা স্মরণ করতেই চোখে পানি আসে, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। যুদ্ধে বিজয় লাভের পর বধ্যভূমিতে দেখা যায় সারি সারি পচা-গলা লাশ, যাদের দুই হাত দড়ি দিয়ে পেছনের দিকে বাঁধা আর সারা শরীরে বেয়নেটের ক্ষত, দেহগুলো ঝাঁঝরা। হায়েনারা চক্ষুচিকিৎসকের চোখ উপড়ে ফেলেছে, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের বুক কেটে হৃদযন্ত্র বের করেছে, লেখকদের হাতের আঙুল কেটে নিয়েছে। কাউকে একা আবার কাউকে পরিবারপরিজনের সামনেই হত্যা করেছে।

আমাদের অন্ধকার সময়ের আলোকিত মানুষগুলো ছিলেন অপার্থিব গুণাবলির অধিকারী। কেউ কবিতা লিখতেন, কেউ গান বাঁধতেন, সুর তুলতেন, গান গাইতেন, সংবাদ কুড়াতেন, চিকিৎসা করতেন, শিক্ষা বিলাতেন, নাটক লিখতেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন আবার কেউ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তখন পুরো বাঙালি জাতি ছিল এক লক্ষ্যে, এক সূত্রে গাঁথা। জাতির পিতার নেতৃত্বে বিভিন্ন পেশার মানুষের একটাই লক্ষ্য ছিল, দেশকে স্বাধীন করা, আর এজন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রেখেছেন। সেদিন কতজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল তার সঠিক ও পুরো তথ্য পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংকলন থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে সেদিন কয়েক হাজার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক নিউজ ম্যাগাজিন *নিউজ উইক*-এর সাংবাদিক নিকোলাস টমালিনের লেখা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা মোট ১ হাজার ৭০ জন। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বেসরকারিভাবে গঠিত বুদ্ধিজীবী নিধন তদন্ত কমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানিরা এদেশের বিশ হাজার বুদ্ধিজীবীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল যদিও তারা সফলকাম হতে পারেনি। বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত যাচাই বাছাই কমিটি দুই পর্বে ৩৩৪ জনের নাম নিশ্চিত করেছে। প্রথম পর্বে ১৯১ জন এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৪৩ জন বুদ্ধিজীবীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্বের কাজ চলমান।

১৯৭১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা অনেক আগেই করেছিল যাতে সহায়তা করেছিল জামায়াতে ইসলামি ও এর ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আসলাম, ক্যাপ্টেন তারেক, কর্নেল তাজ, ভিসি প্রফেসর ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. মোহর আলী, এবিএম খালেক মজুমদার, আশরাফুজ্জামান খান ও চৌধুরী মাইনুদ্দিন আর তাদের নেতা ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশে গণহত্যার অন্যতম কুশীলব। ঘাতকদের হাতে যাঁরা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন– আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, ড. ফজলে রাব্বী, আলীম চৌধুরী, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন এবং নাম না-জানা অনেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী প্রভাষক আনোয়ার পাশা ছিলেন একাধারে কবি, ভাষাবিদ, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রকাশ পেত দেশাত্মবোধ, প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান। আনোয়ার পাশা বাংলাদেশের স্বাধিকার নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস *রাইফেল রোটি আওরাত*-এর রচয়িতা। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং মিরপুরে হত্যা করে।

লেখক, সাংবাদিক ও কমিউনিস্ট নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার সরাসরি ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন এবং অনেক বছর কারাভোগ করেন। তিনি দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' এবং বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় লিখতেন। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর কয়েকজন তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়, তারপর আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কবি মেহেরুন্নেসা তাঁর কবিতায় ঝড় তুলতেন। ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের অকুতোভয় সৈনিক দুই ভাইকে সাথে নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে নিজ বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ২৭শে মার্চ পাকিস্তানি জান্তার দল মিরপুরে তাঁর বাসায় ঢুকে মা ও দুই ভাইসহ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হায়েনার দল মেহেরুন্নেসার খণ্ডিত মাথা দিয়ে ফুটবল খেলেছিল।

প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ড. ফজলে রাব্বী ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জয়েন্ট প্রফেসর, কার্ডিওলজিস্ট এবং মেডিকেল রিসার্চার। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস তিনি ও তাঁর স্ত্রী অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবার ও নির্যাতিতা নারীদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করেছেন। ১৫ই ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে নির্যাতনের পর হত্য করে।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশের অন্যতম আইনজীবী, সমাজকর্মী, ভাষা সৈনিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই সর্বপ্রথম অধিবেশনের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাতেও রাখার দাবি করেন। পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখতে গৃহবন্দি করাসহ নানারকম চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালিদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ রাতে তাঁর ছোটো ছেলে দিলীপ কুমার দত্তসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ময়নামতি সেনানিবাসে হত্যা করে।

দেশের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর কার্যনির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। ক্ষুরধার শাণিত লেখার মাধ্যমে তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সাহসী সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদনের কারণে জামায়াতে ইসলামির মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রাম থেকে তাঁকে হুমকি দিয়েছিল কিন্তু তিনি থেমে যাননি। অবশেষে ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে চামেলীবাগের বাসা থেকে অপহরণ করে, তারপর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নাট্যকার, ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্য-সমালোচক মুনীর চৌধুরী ছিলেন আসামান্য প্রতিভার অধিকারী। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের

সময় কারাগারে বসেই তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত নাটক *কবর*। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ১টায় সেন্ট্রাল রোডের বাসা থেকে বন্দুকের নলের ডগায় তাঁকে তুলে নিয়ে যায়, পরবর্তীতে তাঁকেও খুঁজে পায়নি তাঁর পরিবার।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, যা তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া*-তে প্রতিফলিত হয়েছে। *হাজার বছর ধরে*, *আরেক ফাল্গুন*-এর মতো কালজয়ী উপন্যাসের রচয়িতা জহির রায়হান ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭১ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার এবং আলতাফ মাহমুদকে খুঁজতে গিয়েছিলেন ঢাকার মিরপুরে, তারপর থেকে তাঁকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র আলতাফ মাহমুদ, যিনি ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক, ভাষাসৈনিক ও সংস্কৃতিকর্মী। শহিদ দিবসের অমর রচনা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটির সুরকার। ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত স্বাধীন দেশের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় গণসংগীত গাইতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন, এসময় আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগে নিজ বাসায় এক প্লাটুন গেরিলাদের নিয়ে গোপন ক্যাম্প স্থাপন করেন। ক্যাম্পের কথা ফাঁস হলে ১৯৭১ সালের ৩০শে আগস্ট পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে আটক করে এবং হত্যা করে।

এমনি করে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষের মধ্যে ছিলেন– *সাপ্তাহিক বেগম*, *ললনা* ও *শিলালিপি* পত্রিকার সম্পাদক সেলিনা পারভীন, চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেগম মুশতারী শফি, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, অধ্যাপক রাশিদুল হাসান, অধ্যাপক আবুল খায়ের, নিজাম উদ্দিন আহমেদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, নূতন চন্দ্র সিংহ, সমাজসেবক ও দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রমুখ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন অনেক নক্ষত্রের প্রাণদ্বীপ নিভিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বিনিময়ে হারিয়েছি আমাদের আলোকবর্তিকা, আমাদের পথপ্রদর্শকদের, একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে যাঁদের খুব প্রয়োজন ছিল। তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়ত জাতির পিতাকে সপরিবার শহিদ হতে হতো না, দেশ হতো অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। ১৯৭১ সালে জাতির মেধা ও আলোকবর্তিকাদের হারিয়ে দেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। তবে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির ত্যাগ আর সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। নতুন প্রজন্ম বুদ্ধিজীবীদের দেখানো আলোর পথে ধাবিত হবে এবং দেশ উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে– এটাই সকলের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

১। *উইকিপিডিয়া*, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

২। *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম*, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১

৩। 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস: অলৌকিক মানুষেরা', *যুগান্তর.কম*, শাওন মাহমুদ, ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৯

৪। *নিউজ বাংলা ২৪.কম*, 'শোকাবহ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস: আনন্দের পাশেই শোকের অশ্রু', ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১

৫। *কালের কণ্ঠ*, আজ শহীদ বদ্ধিজীবী দিবস, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২

৬। *কালের কণ্ঠ*, দায় আমাদের সবার, রামেন্দু মজুমদার, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২

মুহা. শিপলু জামান: উপ-প্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা, dps@bangabhaban.gov.bd

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

মানুষ বাঙালি

মুহম্মদ নূরুল হুদা

মানুষ আমরা বাঙালি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে,
মানুষ বাঙালি মুক্ত স্বাধীন শত শতাব্দী শেষে;
অমিত সাহসী প্রমিত বাঙালি শেখ মুজিবের বেশে।

নিকষিত যার মানব স্বরূপ মা-সায়েরার ঘরে,
বিকশিত তার রূপ অপরূপ শত শতাব্দী ধরে;
মুক্তিযুদ্ধে শহিদেরা প্রাণ দিয়ে গেল অকাতরে।

এই বাংলার মাটি পরিপাটি সোনার চেয়েও খাঁটি,
ঘুমায় বাঙালি এ মাটির বুকে বিছিয়ে শীতলপাটি;
নাই নাই ভয়, আছে শুধু জয়, জয় দুর্জয় ঘাঁটি।

গোলাভরা ধান মাঠভরা গান শস্যের সমাহার,
শান্তি সুখের এই বাংলায় সম্প্রীতি বেশুমার;
উদয় শপথে কাটে পথে পথে মনের অন্ধকার।

শুরুর আগেও শুরু থেকে যায়, যায় না সহজে চেনা,
বর্তমান ও অতীতের মাঝে কত সেতু লেনাদেনা;
অনাদিকালের পারানির কড়ি সম্বল বেচাকেনা।

ইতিহাস শুরু লিখিত যখন, তারও আগে ইতিহাস,
গুহা ছেড়ে ঘরে পলল ভিটায় বঙ্গ জাতির বাস;
ঋতুতে ঋতুতে রীতিতে রীতিতে সব ফসলের চাষ।

রাঢ় হরিকেল বন উপবন সমতট আসমান,
মিলেছে এখানে নদী দিগন্ত মোহনায় ধাবমান;
ওড়ে প্রজাপতি, পরিযায়ী ডানা, আলপথ বহমান।

কত পথ শেষে কত দিক থেকে পথিক মিলায় বুক,
বাংলা মায়ের স্নেহশীলা বুকে ব্যাকুল আপন মুখ;
জগৎ মানুষ মিলেছে এ বুকে, মিলনেই মূল সুখ।

মিলিত বাঙালি প্রমিত বাঙালি ঘর তার চরাচর,
কাঁটাতারহীন বিশ্বরাষ্ট্রে সব ঘর তার ঘর;
পরস্পরের পরমাত্মীয়, কেউ নয় কারও পর।

মিলিত বাঙালি বিজয়ী বাঙালি বিশ্ব মানুষ আজ;
সব দেশ তার আপন স্বদেশ, মাথায় মুক্তি তাজ।

বাংলাদেশের বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর

আসলাম সানী

এইতো আমি
এখানেই আমার শেকড় ছিল ভাই
এই যে মাটি
শুভ পরিপাটি
নাভিমূল আমার আকাশ সর্বদাই

বাহান্ন ছিল বাংলা ভাষার
একাত্তর আমার স্বপ্ন আশার
সিরাজ-তিতুমীর
বীর বাঙালি বীর–

রবীন্দ্র-নজরুল
লাল-সবুজের স্বাধীন পতাকা
দোয়েল-শাপলা ফুল
দেশরত্নের উন্নয়নে
বিশ্ব হুলুস্থুল

কৃষক-শ্রমিক-জেলে-তাঁতি
রণাঙ্গনে যুদ্ধে মাতি
নেতা মুজিবুর
ত্যাগ-সাহসে গৌরবান্বিত
ইতিহাস ভাস্বর
বাংলাদেশের বিজয় দিবস
ষোলোই ডিসেম্বর।

প্রিয় বাড়ি

সোহরাব পাশা

এই পৃথিবীর সবচে' সুন্দর বাড়িটি আমার
খেলাঘর থেকে শুনেছি ঘুমের গল্প
অসুস্থ রাতের কান্না
অন্ধকারে অশ্লীল বুলেট
ভাঙা আলো
ভেতরে নৈঃশব্দ্যে জ্বলে ওঠা
তিন খণ্ড কষ্টের হুলিয়া

ভীষণ অস্থির এই বাড়ি
সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ইলামিত্র, দুখিনি মাসিমা
তেভাগা আগুনে পোড়া গরিব আঙুল
ক্ষুধার্ত আকাশ ঠোঁটে
ব্যাকুল দাঁড়িয়ে থাকা
দুখি ছায়াময় এই বাড়ি

বঙ্গবন্ধুর রক্তের লেখা এই বাড়ি
চোখের ভেতর আগুনের সুঁচ ফোটানোর মতো
অনেক মৃত্যুর স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাসে থৈ থৈ
সবুজ বাতাসে কাঁপা ভোরের কুসুম
হঠাৎ রঙিন হয়ে ওঠা রং খসে পড়া স্মৃতি
তীব্র রংধনুর নীচে– শহিদমিনার
আলো আঁধারের বৃষ্টিভেজা
এই বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

কেমন করে স্বাধীনতা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

বাহান্নতে স্বাধীনতার বীজ বুনেছি প্রথমে
তখন থেকে লড়াই করি জাতশত্রু খতমে
লড়াই চলে একনাগাড়ে
হয় না আপোশ-সন্ধি
যোদ্ধারা হয় নিপীড়িত
হয় অনেকেই বন্দি।
কেউবা তাজা রক্ত ঢালে, হয় না তবু শান্ত
শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বাঙালি উদ্ভ্রান্ত।

ছেষট্টিতে ছয় দফাতে কাঁপল শাসকচিত্ত
ক্ষেপলো আরও স্বৈরাচারী পশ্চিমা দুর্বৃত্ত
মুজিব তখন শীর্ষ নেতা
স্বপ্ন দেখান মুক্তির
মূল্য দিতে শিখল জাতি
তাঁর প্রতিটি উক্তির।
লড়াই বাধে তীব্রতর, বাড়ে ক্ষোভের অগ্নি
নামল পথে বৃদ্ধ-যুবা, বাপ-চাচা-ভাই-ভগ্নি।

ধীরে ধীরে আন্দোলনের তীব্রতা পায় বৃদ্ধি
মুক্তি পেতে পুরো জাতি হয় অবিচল জিদ্দি
জনস্রোতে জোয়ার বাড়ে
আগুন বাড়ে তার চে'
মুজিব তখন একাত্তরের
সাত তারিখে, মার্চে–
রেসকোর্সে ভাষণ দিলেন, তীব্র ছিল উক্তি
আর কিছু নয় স্বাধীনতা, চাই মানুষের মুক্তি।

সেই ভাষণে উঠল ফুঁসে জোয়ান-বুড়োসুদ্ধ
শুরু হলো কী প্রতিরোধ আর গেরিলা যুদ্ধ
ছাব্বিশে মার্চ মধ্যরাতেই
দেন ঘোষণা আবার
বীর বাঙালি সাহস পেল
যুদ্ধে ছুটে যাবার
সেদিন থেকেই যুদ্ধ শুরু, ন' মাসে হয় শেষ
ডিসেম্বরের ষোলোতে পাই স্বাধীন বাংলাদেশ।

সেরা এক মহারাজ

অমিত কুমার কুণ্ডু

শত বছরের পরাধীনতার শিকল ভাঙার পরে
শত জনমের স্বাধীনতা এল আমাদের গেঁয়োঘরে
শত প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল হলো দেশ
শত ঝঞ্ঝাট কত বিভ্রাট চিরতরে নিঃশেষ।

এরকম হবে, ভেবেছিল জাতি কিন্তু হলো না সেটা
ভেতরে ভেতরে দেশে বেড়ে ওঠে বিষধর কেউকেটা
এক কালো রাতে কেড়ে নিল তারা সোনার দেশের তাজ
বাঙালি হারালো সর্বকালের সেরা এক মহারাজ।

তিনি আজ নেই তবুও আছেন সবুজে সবুজে মিশে
এই হৃদয়ের রক্তের মাঝে তাই খুঁজে পাই দিশে
মধুমতী আজ যাঁর ছোঁয়া পেয়ে গৌরবে বহমান
তিনি আমাদের জাতির জনক মুজিবুর রহমান।

বিজয় দিবস

অর্ণব আশিক

দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত পুড়ে ছাই
গ্রাম আর গ্রাম নাই
ঘরদোর, কৃষানের লাঙল ও জোয়াল
ভালোবাসা সংসার
খান খান ভেঙেচুরে লোপাট
অগ্নিকুণ্ড নিয়ে শুয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

মা নেই বাবা নেই, ধর্ষিত বোন
কুকুর খাবলে খাচ্ছে ভাইয়ের লাশ
আছে হাহাকার, আছে অশ্রু, আছে জয়ের নেশা
আছে বিধ্বস্ত স্বদেশ, নিজ গ্রাম দেখার তীব্র বাসনা
হাতে রাইফেল, একবুক যন্ত্রণা উজ্জ্বল বুকের গভীরে কাঁদে
মুখে তার উচ্চারিত ধ্বনি
জয় বাংলা, বিজয়ের পদাবলি।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১
নীল ভাঙা রোদ ঢুকে গেছে জয় বাংলা মিছিলে
ছলবল ছলবল উত্তেজনা পথে পথে
মুক্তিযোদ্ধা পাগল নিজ মাটির গন্ধে
কণ্ঠে বাজে–
'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

চোখ করে জ্বল জ্বল
বিজয়ের দিনে
খোঁজে নতুন সংগ্রামের পথ
দেশ গড়ার
আগামীর উঠোনে।

শ্যামল বরণ বাংলা আমার

মিয়াজান কবীর

শ্যামল বরণ বাংলার রূপ যে দেখেছি,
শ্যামল শোভা রূপে আকুল হয়েছি।
তাল-তমালের শ্যামল ছায়া
প্রাণে জাগায় কোমল মায়া
শীতল ছায়ায় পথ চলেছি।
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
বউ কথা কও পাখি ডাকে
পাখির কণ্ঠে গান শুনেছি।
গাছে গাছে আলোকলতা
দোদুল দোলায় ছন্দ কথা
স্বপ্ন জালের মালা গেঁথেছি।
ধলেশ্বরীর বাঁকে বাঁকে
বউ-ঝি চলে কলসি কাঁখে
দুই নয়নে সে ছবি এঁকেছি।

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ

মোহাম্মদ শাহজাহান

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করে। ড. ওয়াজেদ মিয়া তাঁর *স্মৃতিকথা/মূলক* গ্রন্থে লিখেছেন– ৭ই মার্চ ভাষণ দিয়ে বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বলেন, 'পাকিস্তানি সৈন্যরা যে-কোনো সময় আমাকে মেরে ফেলতে পারে। আজ থেকে তোমরা সকলে আমার সাথে খাবে।' হত্যা করা হতে পারে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত জেনেও ২৫শে মার্চ রাতে বাসা থেকে তিনি আত্মগোপনে যাননি। স্বাধীনতা লাভের পর একটি বিদেশি পত্রিকা লিখেছিল– 'রক্তই যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়, তাহলে বাংলাদেশকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।' বাঙালি জাতির ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন বিশ্বমানের নেতা। বঙ্গবন্ধুর মতো একজন দূরদর্শী, সাহসী, ত্যাগী ও বিচক্ষণ নেতার জন্ম হয়েছিল বলেই একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো আর কোনো রাজনৈতিক নেতা দেশের মানুষকে এভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হননি। যেজন্য একাত্তরের ৭ই মার্চ পাকিস্তানি কামান-বন্দুক-মেশিনগানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের একজন সত্যিকারের অভিভাবকের মতো নির্দেশ দেন– 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো– প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'

দেশের সাধারণ মানুষ থেকে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত একাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খান অন্য পাকিস্তানিদের তুলনায় মানবিক গুণসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চে ইয়াকুব খানকে বরখাস্ত করে 'বেলুচিস্তানের কসাই' হিসেবে পরিচিত জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ টিক্কা খান ঢাকা আসেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী শপথ করাতে অস্বীকার করেন গভর্নর টিক্কা খানকে। ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে শপথ নেন। মার্চের আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, সংকট নিরসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করতে জে. ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ১৯৭১ ঢাকা আসেন। কিন্তু বাঙালি বাবুর্চিরা ইয়াহিয়া খানের রান্না করতে অস্বীকার করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দপ্তর থেকে একজন কর্মকর্তা কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে যোগাযোগ করা হলে বাবুর্চিদের বলা হয়– 'বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি'। গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে বাবুর্চিরা রান্না করতে রাজি হন। এভাবে সর্বস্তরের জনগণ একাত্তরে মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারাও বঙ্গবন্ধুর নামেই যুদ্ধ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন শত্রু পাকিস্তান সরকারের কারাগারে বন্দি। এখানে গুলিবিদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী এক মুক্তিযোদ্ধার ঘটনা উল্লেখ করা হলো। সেক্টর কমান্ডার পরে সেনাপ্রধান ও সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল কেএম সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকারে এবং মেজর জেনারেল এমএসএ ভূঁইয়ার লেখা থেকে ঘটনাটি জানা গেছে। ১৯৭১-এর ২১শে জুন সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। দুলু নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা একটি মেশিনগানের সাহায্যে পাকিস্তানি সৈন্যদের থামিয়ে দেয়। দুলু মেশিনগান থেকে অনবরত গুলি চালাতে থাকেন। আর মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানি বের হয়ে আসে। ঐ সময় পাকিস্তানি সেনাদের গুলি এসে দুলু মিয়ার পেটে লাগে। শত্রুর গুলির আঘাতে দুলুর পেট ছিড়ে রক্ত পড়া শুরু হয়। ঐ অবস্থায়ও দুলু এক হাতে পেট ধরে রেখে অন্য হাতে মেশিনগান চালাতে থাকেন। অধিনায়ক সফিউল্লাহকে দেখে কেঁদে কেঁদে দুলু বলেন, "স্যার, আপনি যে আমাকে যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছেন এ জন্য আপনার কাছে আমি ঋণী। আমার গায়ের রক্তাক্ত জামাটা শেখ মুজিবকে দেখাবেন। তিনি বলেছিলেন– 'তোমরা রক্ত দেয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে যাও।' আমি রক্ত দিয়েছি। আমি এখন মৃত্যুর পথে। আমার মৃত্যু হলে বাংলাদেশের মাটিতে কবর দিবেন।" অধিনায়ক সফিউল্লাহ নিজে মুক্তিযোদ্ধা দুলুকে তাঁর গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। দুলুর মতোই লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরে মুজিবের নামেই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দুলু পিতামাতা, স্ত্রী ও একমাত্র

মেয়ের কথা না বলে শেখ মুজিবের কথাই বলেছিলেন। দুলু মিয়ার বিশ্বাস ছিল, তাঁর দেশ স্বাধীন হবেই। বাংলাদেশের মাটিতে কবর দেওয়ার আকুতির মাধ্যমে দুলুর দেশপ্রেমের কথাই ফুটে উঠেছে। অবশ্য দুলু বেঁচে গিয়েছিলেন। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ পরে তাঁকে সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রদান করেন। জে. সফিউল্লাহ ও জে. ভূঁইয়া দুজনের কাছেই বিভিন্ন সময়ে এসেছেন এবং তাঁরা তাঁকে সহায়তাও করেছেন। রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের মহানায়ক শেখ মুজিবের আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করেই 'জয় বাংলা– জয় বঙ্গবন্ধু' বলে হাসতে হাসতে জীবন দান করেছেন। যুদ্ধের শেষদিকে ১৯৭১-এর ১১ই নভেম্বর *দি নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার খবরে বলা হয়– 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতকতার দোষে (পাকিস্তানিদের ভাষায়) এখন পাকিস্তান জেলে বন্দি। একজন গেরিলা যোদ্ধা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমরা যদ্দুর জানি, শেখ মুজিব আর নেই। শত্রুর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে স্বাধীনতাকামী বাঙালির নেতা হিসেবে। তবে যদি তিনি বেঁচে থাকেন এবং ইসলামাবাদ সরকারের সাথে আপোশ করে তিনি ছাড়া পান, তাঁকে আমাদের হাতেই মরতে হবে। শেখ মুজিব আমাদের সবার মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। তিনি জীবিত কী মৃত সেটা বড়ো কথা নয়, তাঁর ফাইটিং স্পিরিট আমাদের বুকে জ্বলছে অনির্বাণ শিখার মতো।' কেউ কেউ বলেন, মুজিবের কালজয়ী নেতৃত্বে একাত্তরে পুরো বাঙালি জাতি যেন একজন মানুষেই পরিণত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ বছরের মুক্তিসংগ্রামের ফসল একাত্তরের স্বাধীনতা। মাত্র ২৩ বছরে পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্রকে ভেঙে চুরমার করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করা বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি। মুজিব এমন একজন নেতা ছিলেন, যার তুলনা তিনি নিজেই। সত্তরের নির্বাচনে দেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি মানুষের সমর্থন, একাত্তরের ৭ই মার্চের বিখ্যাত ভাষণ, উনসত্তরের ৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের নামকরণ, তারও কয়েক বছর আগে খাবার টেবিলে পরিবারের সদস্য ও জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে আলাপচারিতায় কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা' গানকে স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত করার চিন্তা-ভাবনা, ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনসহ সারা দেশে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেওয়া এবং নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শেখ মুজিব তাঁর জীবিতকালেই কিংবদন্তি নেতায় পরিণত হয়ে যান।

বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিব– একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের নির্বাচনই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি। ঐ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের নেতা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি শাসকচক্র প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন ১লা মার্চ আকস্মিকভাবে স্থগিত করা হয়। বাংলার জনগণ মেনে নিতে পারল না। মুহূর্তে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ। বিদ্যুৎগতিতে রাস্তায় বের হয়ে এল বাংলার মানুষ। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতাহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। সভামঞ্চ থেকে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা' গানকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা মঞ্চে পতপত করে উড়তে থাকে। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন পল্টনের ঐ ছাত্র জনসভায় স্বাধীনতার মহানায়ক শেখ মুজিব মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দশ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে পাকিস্তান সামরিক চক্রের কামান-বন্দুকের হুমকির মুখে নির্ভীক শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনের সিপাহসালার বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিবো, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।'

৭ই মার্চের পর স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি-আন্দোলনের সূতিকাগার ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার নামে ষড়যন্ত্র করে বাংলার মানুষের ওপর সামরিক হামলার নির্দেশ দিয়ে ২৫শে মার্চ গোপনে শেষবারের মতো ঢাকা ত্যাগ করেন। তাজউদ্দীন আহমদসহ দলীয় নেতাদের পরবর্তীতে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৫শে মার্চ বিকেলে ড. রেহমান সোবহানের উপস্থিতিতে পাকিস্তানের সাংবাদিক তারিক আলীর বাবা মাজহার আলী খানকে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনী আঘাত

হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইয়াহিয়া মনে করেছে যে, আমাকে হত্যা করলেই সে আন্দোলন ধ্বংস করে দিতে পারবে। কিন্তু সে ভুল করছে। আমার কবরের ওপর স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে।'

প্রতিবেশী ভারত ও বৃহৎ শক্তি রাশিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান ও সৌদি আরব প্রবলভাবে বিরোধিতা করে। ঘরের শত্রু বিভীষণ– পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন-পাকিস্তান চক্রের যোগসাজশে তলে তলে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিক্সন-কিসিঞ্জার-ভুট্টো চক্র কোনোভাবেই পাকিস্তানের বিভক্তি মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অজেয় শক্তি এবং ধীর-স্থির কৌশলী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রতিবেশী ভারত বিশেষ করে সে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও ইন্দিরা গান্ধীর অবদান চির স্মরণীয়। শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাসহ এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দেওয়া, ভরণপোষণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেওয়া, আমেরিকা-চীন-পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবিলায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ও ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন– তার কোনো তুলনা হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৪ হাজার ভারতীয় সেনা সদস্য জীবন দান করেছেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। নয় মাসের যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত ও সে দেশের প্রধানমন্ত্রী সর্বতোভাবে পাশে না থাকলে বাংলাদেশ ও বাংলার মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশা ও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতো।

২৩ বছরের মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কোনো তুলনা হয় না। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান পরে রাজনীতিবিদ আসগর খান তাঁর *জেনারেলস ইন পলিটিক্স* গ্রন্থে লিখেছেন : "... একাত্তরের মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমি ঢাকা যাই। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করি। আমি মুজিবুর রহমানকে প্রশ্ন করলাম, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কীরূপে নেবে এবং এ অচলাবস্থার অবসান কীভাবে সম্ভব। উত্তরে মুজিব বলেন, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত সহজ। ইয়াহিয়া খান প্রথম ঢাকা আসবেন, প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান এমএম আহমদ তাকে অনুসরণ করবেন। এরপর আসবেন ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিবেন এবং এভাবেই পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি ঘটবে।' নিজের সম্পর্কে তিনি ধারণা করেন যে, তাকে গ্রেপ্তার করা হবে কিংবা সেনাবাহিনী বা তার অনুচরেরা তাকে হত্যা করবে। বিস্ময়ের কথা, পরবর্তী ঘটনাগুলো ঠিক সেভাবেই ঘটে যাচ্ছিল, যা তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন।"... (পৃষ্ঠা ৩২)। ১৯৭১-এর মার্চে বিখ্যাত *টাইমস* সাময়িকী লিখে : 'আসন্ন বিভক্তি অর্থাৎ পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিব।' ঐ সময় *টাইমস*-এর সংবাদদাতা ডন কগিনকে মুজিব বলেন, 'পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, সমঝোতার আর কোনো আশা নেই।'

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে সাংবাদিক সিরিলডন লিখেন, 'মাতৃভূমিকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার জন্য বর্তমানের চমকপ্রদ নাটকীয় যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার ঘটনা শেখ মুজিবের একদিনের ইতিহাস নয়, ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি তার লক্ষ্য ছিল।' একাত্তরের ৫ই এপ্রিল আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকী *নিউজউইক*-এর প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছেপে বলা হয়– '২৬শে মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' একই প্রতিবেদনে শেখ মুজিবকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। জানা মতে, *নিউজউইকের* শত বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর আর কোনো রাজনীতিবিদকে 'রাজনীতির কবি' বলে সম্মান জানানো হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিবিসির খবরে বলা হয়– 'বাংলাদেশে যা কিছুই ঘটুক না কেন শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেই মানুষটি হিসেবে, যিনি না হলে বাংলাদেশের জন্মই হতো না।'

স্বাধীন বাংলাদেশের 'মধুচন্দ্রিমা' বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, সেই অপশক্তিই পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট তাদের এদেশীয় এজেন্ট জিয়া, মোশতাক, ফারুক, রশিদ, ডালিম, নূর চক্রের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করার জন্যই ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। ডামি হিসেবে মোশতাককে ১৫ই আগস্ট ক্ষমতায় বসানো হলেও তিন মাসের মাথায় মোশতাককে সরিয়ে মূল চক্রান্তকারী জিয়াকে ক্ষমতায় বসানো হয়। জিয়া তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরকে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে পাকিস্তানের আদলে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করেন। জিয়ার পর এরশাদ ও খালেদা– জিয়ার অসমাপ্ত কর্মসূচি সম্পন্ন করেন। জিয়া দৃশ্যত মুক্তিযোদ্ধা হলেও তিনি স্বাধীনতাবিরোধীদের এদেশের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাড়ে তিন দশক পর হত্যাকারী ঘৃণ্য ঘাতকদের বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি কার্যকর হয়। স্বাধীনতা লাভের চার দশক পর একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার এবং তাদের ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করেছে শেখ হাসিনা সরকার। জননেত্রীর টানা তিন মেয়াদের শাসনামলে অর্থনৈতিকভাবে দেশ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আজ অন্যতম শীর্ষ বিশ্বনেতা।

দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা বিশ্বসেরা নেতা শেখ মুজিব এবং জেলে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের হত্যা করতে ২১শে আগস্ট ২০০৪ প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলা হয়েছে।

সত্তরের নির্বাচন স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে আর হারাতে চায় না। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বা তাদের দোসর যেন আর কোনোদিন বাংলার মসনদে বসতে না পারে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ যেন আবারও ছিনতাই না হয়। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে– এটাই হোক এবারের বিজয় দিবসের শপথ। জয় বাংলা।

মোহাম্মদ শাহজাহান: বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ গবেষক; সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা, bandhu.ch77@yahoo.com

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/মগের জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

বঙ্গবন্ধু বাংলার বিজয়

মিলন সব্যসাচী

বঙ্গবন্ধু জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু বাংলার বিজয়
বঙ্গবন্ধু স্বাধীন স্বদেশ
মহাকালের মহান নেতা সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়।

বঙ্গবন্ধু মানব প্রাচীর
বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী সতীর্থ
বঙ্গবন্ধু নন্দিত নায়ক
নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসা।

বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী চেতনা
বঙ্গবন্ধু প্রদীপ্ত প্রেরণা
বঙ্গবন্ধু সাহসী পথিক
পথভ্রষ্ট বাঙালি জাতির নিত্য পথের দিশা।

বঙ্গবন্ধু অসীম আকাশ
বঙ্গবন্ধু নতুন ইতিহাস
বঙ্গবন্ধু মুক্তির মশাল
দুর্ভেদ্য আঁধার বিনাশী অন্তহীন আলোর স্ফুলিঙ্গ।

বঙ্গবন্ধু মাটির প্রদীপ
বঙ্গবন্ধু প্রথম প্রভাত
বঙ্গবন্ধু সোনালি রোদ্দুর
নবালোয় উদ্ভাসিত নতুন দিনের আলোকিত বাতিঘর।

বঙ্গবন্ধু শাশ্বত প্রকৃতি
বঙ্গবন্ধু শান্তির সংগীত
বঙ্গবন্ধু অনন্ত আগামী
দিগন্ত বিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গ প্রবহমান স্বপ্নিল সমুদ্র।

বঙ্গবন্ধু মুক্তির সংগ্রাম
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্বপ্ন
বঙ্গবন্ধু আরাধ্য সন্তান
সুযোগ্য পিতার-রত্নগর্ভা মাতার প্রার্থিত প্রার্থনা।

বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব
বঙ্গবন্ধু অম্লান প্রত্যাশা
বঙ্গবন্ধু অভয় অরণ্য
জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধায় স্মরণে বরণে শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

আজ ষোলোই ডিসেম্বর

বাবুল তালুকদার

আজ ষোলোই ডিসেম্বর
পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে দলবেঁধে ছুটে স্মৃতিস্তম্ভে মানুষ
শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে
লক্ষ-কোটি মানুষ চিরনিদ্রায়
বাংলার চারপাশে বীর শহিদদের কবর
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে দেশ রক্ষার জন্য
যুদ্ধ করেছে এই বাংলার মাটিতে
আমরা তাঁদের আজও স্মরণ করি শ্রদ্ধা জানাই।
শহিদ যোদ্ধার মা ও বাবা, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর
চোখে আজও পানি ঝরছে
শোকের মাতম বইছে অন্তরে
বেদনা আর কষ্টে বুক যেন পাথর হয়েছে
আকাশ-বাতাস আজও
থরথর কাঁপছে ব্যাকুল হয়ে আছে প্রকৃতির চারপাশ
প্রতিবছর কেটে যায় এভাবেই ষোলোই ডিসেম্বর
তবু, মানুষ বিজয়ের গান গায় বাংলার বুকে
শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানায় প্রতিটি মানুষ
নীরবতা পালন করে স্মৃতিস্তম্ভে
পুষ্পমাল্য দিয়ে অন্তর গহীনে শান্তি পায়
বাঙালি জাতির গর্ব ও অহংকার
সারা বিশ্বজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের দেশ
বিজয়ের দেশ, স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

স্বদেশের জন্য প্রার্থনা

খান চমন-ই-এলাহি

প্রিয় স্বদেশ আমার
মা-মাটি-মাতৃভাষায় দুচোখে আঁকা
প্রাণের বাংলাদেশ।
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, মধুমতী-কর্ণফুলি তীর
সবুজ শস্যের মাঠ
পাহাড়ি ঝরনার গান
সমতলের হাসি-নদীর কলতান
পাখি ডাকা ভোর
আদিগন্ত তোমাকে জানায় সম্ভাষণ।
এখানে আকাশ এখানে মৃত্তিকা
এই জল এই অগ্নি
উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম বিভেদ ভুলে
ঐক্যের আহ্বানে স্যালুট জানায়।
তুমিহীন আমি কেউ নই
কিছুই আমার নয়
এই আমি, সবিনয় তোমার প্রণয়কাতর
জানে অন্তর জানে অন্তর্যামী।
নিকষ অন্ধকারে সূর্যের রঙে
কর্মে কিংবা বিশ্রামে
তোমার কল্যাণে প্রার্থনা নত হই।
আমাকে আগলে রাখো
হে আমার জননী-পিতৃপুরুষের দেশ
আমার বাংলাদেশ।

বীর বাঙালির বিজয়

শাফিকুর রাহী

ফেনী নদীর কোলটি ঘেঁষে অজপাড়া গ্রামে
বীর গেরিলা সাহস বুকে দুঃসহ সংগ্রামে।
সিলোনিয়া মাতুভূঁইয়া দাগনভূঁইয়ার মাঠে
দুধমুখা ও বৈরাগির বাজার কোরশমুন্সি হাটে–
বীরতারুণ্য সম্মুখযুদ্ধে প্রবল প্রভায় ছোটে
ভয়কে জয়ের তীব্র তোড়ে বারুদ হয়ে ফোটে।

বেকের বাজার শৈস্যদিয়ায় জলসকরার জলে
নিঝুম নিবিড় মেঠোপথে গভীর বনজঙ্গলে
দুই সতীনের দিঘির পাড়ে যুদ্ধঘাঁটি গড়ে
বাংলা মায়ের মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে লড়ে।
বেলুনিয়া হয়ে সিলনিয়া নির্জন খালের পাড়ে
বীর যোদ্ধা হানলো আঘাত শত্রুদের বাঙ্কারে।

গণহত্যার আদিম থাবায় নিভলো জীবনবাতি
একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ কী ভয়ানক রাতি
টিক্কা-ভুট্টো-ইয়াহিয়ার দানবীয় ত্রাসে
বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলা রক্তবানে ভাসে
শত বাধার আঁধার ভাঙার দীপ্ত শপথ পাঠে
যুদ্ধ জয়ের বাঙ্কার গড়ে দিঘির নিঝুম ঘাটে।

গজারিয়া নন্দীর গাঁও সাপুয়া শিবপুরে,
বর্গি-দস্যু হানলো আঘাত বাজার-রাজাপুরে।
গ্রামের পরে গ্রাম জ্বালালো পাকিস্তানি দানো–
সেই যুদ্ধে শহিদ হলো ত্রিশ লক্ষ প্রাণও।
আলিপুর ও কামারপুকুর খুশিপুরের যুদ্ধে
মুক্তিপাগল বীর যোদ্ধা খানসেনার বিরুদ্ধে–

বীর দাপটে জানান দিলো বাংলা ছেড়ে ভাগো;
মরবো না হয় বাঁচবো আমরা বাঙালিরা জাগো।
সারা জাহান উঠলো কেঁপে কৃষ্ণভয়াল রাতে
কাঁপলো আকাশ মাটি-মানুষ বর্গিদের উৎপাতে।
যুদ্ধ চলে জলে-স্থলে, যুদ্ধ আকাশ পথে,
বীর বাঙালি উঠলো জেগে স্বপ্ন জয়ের রথে।

আন্ধার মানিক সুবর্ণচর হাতিয়া সন্দ্বীপে
রামগতি ও মিরসরায়ে জীবনবাতি নিভে–
বর্গিদানো মিলিটারি দরিয়ার ঢেউ নীলে
প্রাণবিনাশী হামলা চালায় চরকাঁকড়া-গাঙচিলে
নির্বিচারে কী যে নির্মম গণহত্যা চালায়;
বীর গেরিলার প্রতিরোধে ডিসেম্বরে পালায়।

দখলদারের মারণ ত্রাসে বীভৎস উল্লাসে
আকাশ-বাতাস থমকে দাঁড়ায় যুদ্ধেরই নয় মাসে
ত্রিশ লক্ষ শহিদ হলো গণহত্যার কালে
অবশেষে উড়লো কেতন মাঝির নায়ের পালে।
বাংলা মায়ের মলিন মুখে চন্দ্র-তারা নাচে
বনহরিয়াল উঠলো গেয়ে বটপাকুরের গাছে।

বীর বাঙালির বিজয় মানে বিপুল আত্মদানে
বিস্মিত হয় বিশ্ববাসী যুদ্ধ জয়ের গানে।
আপনহারার কান্নায় আজো বাতাস থমকে দাঁড়ায়;
গভীর রাতে বিলাপ করে কোন সে স্বজনহারায়!
যে মা আমার স্বামী-সন্তান বসতভিটেহারা
তোমরা কী সান্ত্বনা দেবে; যে মা পাগলপারা!

বিজয়ের সুখ

আতিক রহমান

স্বাধীনতা ওই বিশাল আকাশে নীলের খাতায় আঁকা
স্বাধীনতা ওই স্বপ্নের নদী বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা!
আমি তো স্বাধীন তাই তো স্বাধীন ভাবনার ছবি আঁকি
আমার দুচোখে সবুজে-সবুজে স্বপ্নের মাখামাখি।
স্বপ্ন আমার স্বপ্নের মতো স্বাধীন হাওয়ায় ভাসে
ভোরের সোনালি রোদের খেলায় আমার স্বপ্ন হাসে!
আঁধার রাতের জ্যোৎস্নার ফুল-তারাদের ঝিলিমিলি
আমার মনের রঙিন আবেগে কেটে যায় তারা বিলি।
আমার স্বপ্ন লাল ইতিহাসে সবুজ বর্ণমালা...
আমার স্বপ্ন মায়ের অশ্রু, বোনের বুকের জ্বালা
আমার স্বপ্ন সফলতা পেল লাখো বীরদের প্রাণে
একটি সাগর রক্ত আমার স্বপ্নকে বয়ে আনে।
শেখ মুজিবের দীপ্ত ভাষণে আমার স্বপ্ন বোনা...
আমার স্বপ্ন প্রিয় স্বাধীনতা মুক্ত-মানিক-সোনা।
যুদ্ধে-যুদ্ধে নয় মাস শেষে উঠল নতুন রবি–
সেই সে স্বাধীন সূর্যে হাসলো আমার দেশের ছবি!
অধীনতা থেকে স্বাধীন হলাম এমনি করেই আমি;
বিজয়ের সুখে এদেশ আমার প্রাণের চেয়েও দামি।

বিজয়ের পতাকাজুড়ে

সুজিত হালদার

তুমিতো এসেছ বাংলা ভাষা
বরেন্দ্র বাঙালির উজ্জীবিত চেতনা হয়ে
এই বাংলার গিরিখাত পলিবিধৌত নদী বয়ে।
তুমিতো এসেছ চর্যাপদের অক্ষরবৃত্ত ঘুরে
সূর্যদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পতাকাজুড়ে
এক নদী রক্ত পেরিয়ে হেমন্তের ভোরে।

তুমিতো এসেছ এই বাংলায় ধানের গন্ধ মেখে
সাহসী পদ্মার ঢেউ ভেঙে বীরাঙ্গনার সম্ভ্রমে
তুমিতো এসেছ সন্দর্শন কোনো ফসলের মাঠ চষে
সচিত্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাতৃ ছবি এঁকে।

তুমিতো এসেছ লাল সূর্য ওঠা পতাকার বুকে
যেখানে বাঙালি একই গোত্রে গাঁথা
তার আত্মমর্যাদার রক্ত ঝরা শোকে।
তুমিতো এসেছ একটি বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি থেকে
গণতন্ত্রের মানসকন্যার হাতে
বাঙালি জাতির বিজয়ের পতাকাজুড়ে।

মুক্তিযুদ্ধে খুলনার কমার্স কলেজ

কাজী মোতাহার রহমান

পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। এ অভূতপূর্ব বিজয়ের পর জয়ী দল একাত্তরের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শুভ মুহূর্ত গুণতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির এ বিজয় মেনে নিতে পারেনি। পর্দার আড়ালে শুরু হয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জে. আগা ইয়াহিয়া খান একাত্তরের ৩রা মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, একাত্তরের ১লা মার্চ। সকাল থেকে খুলনা শহরে ইথারে ইথারে খবর ভেসে আসে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। দুপুর ১টা নাগাদ প্রেসিডেন্টের ভাষণের পরিবর্তে রেডিওতে জাতীয় সংসদের ৩রা মার্চ-এর অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা প্রচারিত হয়। রেডিওতে এ ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে। সোচ্চার কণ্ঠে সেদিন ছাত্র-জনতার স্লোগান ছিল– 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'ছয় দফা না এক দফা, স্বাধীনতা স্বাধীনতা' এবং 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী শহীদ আনোয়ার হোসেন আনু

গল্লামারী যুদ্ধের অধিনায়ক শহীদ সুবেদার মেজর জয়নুল আবেদিন

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে শহরের স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রাবাস ছেড়ে শিক্ষার্থীদের একাংশ গ্রামে ফিরে যায়। শিক্ষাঙ্গনের পাশের মেসে স্বাধীনতা প্রত্যাশী ছাত্ররা অবস্থান করে। তখনকার দিনে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মেডিকেল কলেজ ছিল না। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আযম খান কমার্স কলেজ, দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজ, খুলনা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়, সিটি কলেজ, সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় ও সিটি ল' কলেজ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে মার্চের প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য শহরের দেয়াল লিখনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শহরের আহসান আহমেদ রোডস্থ টিঅ্যান্ডটি অফিসের (অধুনালুপ্ত) সামনে, পিকচার প্যালেস মোড়, নগর ভবন ও তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, খুলনার প্রধান গেটের কাছে গভীর রাতে দেয়াল লিখন হয়। দেয়াল লিখনের ভাষাটি ছিল– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। গভীর রাতের দেয়াল লিখনের নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী শেখ আব্দুল কাইয়ুম। এতে অংশ নেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সুশান্ত কুমার নন্দী, আব্দুস সবুর, ইউসুফ আলী ভূঁইয়া, আ ব ম নুরুল আলম, নুরুল ইসলাম খোকন ও শামসুদ্দোহা টিপু।

১লা মার্চ সরকারি বিএল কলেজে বিএ অনার্স পরীক্ষা চলছিল। কলেজের অধ্যক্ষ এম বি চৌধুরী সেদিন বেতারের ঘোষণা এবং সংসদ অধিবেশন স্থগিতের খবর পরীক্ষার্থীদের অবহিত করেন। বিএল কলেজ ছাত্র সংসদের তৎকালীন ভি.পি. স. ম. বাবর আলীর (১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য) নেতৃত্বে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বর্জন করে। তাঁরা কলেজ অঙ্গন থেকে জঙ্গি মিছিল বের করে। বিকেলে ছাত্রলীগের উদ্যোগে আযম খান কমার্স কলেজ থেকে জঙ্গি মিছিল হাদিস পার্কের উদ্দেশে বের হয়। সেসময় শহরের বেসরকারি কলেজের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া এ কলেজ মূল

শহরে অবস্থিত হওয়ায় ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ২রা মার্চ এ কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে স্বাধীনতার দাবিতে ছাত্রলীগের একটি জঙ্গি মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। একাত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে এ কলেজের ছাত্র সংসদের ভি.পি. হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ছাত্রলীগ নেতা শাহনেওয়াজ জামান চৌধুরী আজাদ ও জি. এস. আফজাল হোসেন।

এ কলেজে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তরা হচ্ছেন– মরহুম জাহিদুর রহমান জাহিদ, বিনয় ভূষণ চ্যাটার্জী, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত কুমার নন্দী, যুগ্ম সম্পাদক শেখ আব্দুল কাইয়ুম, সৈয়দ মনোয়ার আলী, মো. কায়কোবাদ আলী, স ম আব্দুস সাত্তার, আব্দুস সবুর, শাহ আবুল কাশেম, শাহ আবুল কালাম, এস. এম. দাউদ আলী, ফেরদৌস আলম, গোলাম রসুল, কুদরুত ই এলাহী, মিজানুর রহমান, মো. সোবহান গোলদার, টি এম নিজানুল হক, রুহুল আমিন, মো. আবু জাফর, শেখ জামসেদ হোসেন প্রমুখ। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তরা হচ্ছেন নারায়ণ চন্দ্র (পরবর্তীতে অধ্যক্ষ), রনজিৎ দত্ত, মো. লিয়াকত আলী মিনা, এম আব্দুল্লাহ (পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের ধর্মমন্ত্রী), আব্দুল মজিদ মল্লিক, আমিনুল হক, সাদিক পল্টু ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর হারুন-অর-রশীদ।

৩রা মার্চ স্বাধীনতার দাবিতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্ক (বর্তমান শহিদ হাদিস পার্ক) থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জঙ্গি মিছিল বের হয়। লোয়ার যশোর রোডস্থ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে বেলুচ পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে সাতজন শহিদ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আব্দুল আজিজ, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান খান, জাতীয় পরিষদ সদস্য সালাহউদ্দিন ইউসুফ, এম এ গফুর, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য অ্যাড. মোমিন উদ্দিন আহমেদ, অ্যাড. মোহাম্মদ এনায়েত আলী, জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান শেখ কামরুজ্জামান টুকু প্রমুখ। ছাত্র-জনতার কাছে স্পষ্ট হয় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। ফলে ছাত্র-জনতা অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ৩রা মার্চ বিকেলে ছাত্রসমাজ খুলনা শহরের কালীবাড়ি রোড এবং কে ডি ঘোষ রোডস্থ কয়েকটি বন্দুকের দোকান লুটের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করে। এতে কমার্স কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শেখ কামরুজ্জামান টুকু, বি.কম শেষ বর্ষের ছাত্র সুশান্ত কুমার নন্দী, শেখ কাইয়ুম প্রমুখরা অংশ নেন।

৭ই মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের খুলনা কমিটি গঠিত হয়। ছাত্রলীগের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে এখানে আহ্বায়ক মনোনীত করা সম্ভব হয়নি। বিএল কলেজ ছাত্র সংসদের তৎকালীন ভি.পি. স. ম. বাবর আলী ও হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়। এ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন– শেখ আব্দুল কাইয়ুম, ইস্কান্দার কবীর বাচ্চু, শেখ শহীদুল হক, হায়দার গাজী, সালাউদ্দিন রুনু, হেকমত আলী ভূঁইয়া, আবুল কাশেম (পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ার), ফ. ম. সিরাজ, মাহাবুবুল আলম হিরণ, শেখ শওকত আলী ও মিজানুর রহমান। ছাত্রলীগের ত্যাগী কর্মীদের নিয়ে 'জয় বাংলা' বাহিনী গঠন করা হয়। জয় বাংলা বাহিনী, খুলনার প্রধান ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক শেখ আব্দুল কাইয়ুম। এ বাহিনী জিলা স্কুল মাঠে প্রতিদিন বিকেলে স্কুলের ক্যাডেটদের ডামি রাইফেল নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ শুরু করে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা হচ্ছেন– ইউসুফ আলী ভূঁইয়া, আব্দুস সবুর, নূরুল ইসলাম খোকন, শামসুদ্দোহা টিপু, সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় জিলা স্কুল মাঠে প্রশিক্ষণের সময় ব্যাপক সাড়া পায়। ২৩শে মার্চ সকাল ১০টায় সাদা পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে জয় বাংলা বাহিনী মিউনিসিপ্যাল পার্কে উপস্থিত হয়। এ বাহিনীর প্রধান শেখ আব্দুল কাইয়ুম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। খুলনায় এই প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমে সার্কিট হাউসে, পর্যায়ক্রমে নূরনগর, শিপইয়ার্ড, পিএমজি, রুজভেল্ট জেটি, খালিশপুর পিপলস মিল, বর্তমান অফিসার্স ক্লাব ও গল্লামারীস্থ বেতার কেন্দ্রে সেনা ছাউনি গড়ে তোলে।

এখানে পাকিস্তানি দায়িত্বে ছিলেন ২২ এফ রেজিমেন্টের লে. কর্নেল শামস। তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা প্রত্যাশীদের তালিকা এবং হত্যার নীলনকশা তৈরি হয়। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন সার্চ লাইট শুরু করলে যশোর ও জাহানাবাদ (খুলনার ফুলতলা) সেনানিবাস থেকে পাঞ্জাবি সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে বাইরে আসতে থাকে। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী খুলনা জেলা প্রধান শেখ কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে কয়েক জন জিপ যোগে টহল দেওয়ার সময় ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যরা তাঁদেরকে ঢাকায় গণহত্যার খবর জানায়। এ খবর পাওয়ার পর শহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক স্থানীয় ছাত্র-যুবকরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৬শে মার্চ খানজাহান আলী রোডস্থ কবীর মঞ্জিলে (আলিয়া মাদ্রাসার অদূরে) এক বৈঠকে বিপ্লবী পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় এ পরিষদই খুলনা জেলায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে। কমিটির চেয়ারম্যান শেখ কামরুজ্জামান টুকু, সদস্যবৃন্দ কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা অ্যাড. কেএস জামান, বিএল কলেজ ছাত্র সংসদের ভি.পি. স. ম. বাবর আলী, জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শেখ আব্দুল কাইয়ুম ও ডা. আশিকুর রহমান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৬৪ সালে এ প্রতিষ্ঠানে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন শেখ কামরুজ্জামান টুকু। এখান থেকেই তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে খুলনা জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক ও ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে ছাত্রলীগের কর্মীদের মুজিব বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের হাফলং ও দেরাদুনে প্রশিক্ষণে পাঠান। তিনি বৃহত্তর খুলনা মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন খুলনা অঞ্চলে ৮০টি ক্যাম্পের নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে বাগেরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। দক্ষিণ জনপদে এ বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা কমার্স কলেজের গর্ব। এ প্রতিষ্ঠানের আরও একজন গর্বিত শিক্ষার্থী শেখ আব্দুল কাইয়ুম। তিনি ১৯৬৯-১৯৭১ পর্যন্ত খুলনা জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১-এর মার্চে জয় বাংলা বাহিনীর প্রধান হিসেবে ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন। খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার কপিলমুনি রাজাকার ক্যাম্পের পতনের পর যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। ১৯৭৪ সালে খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। হাদিস পার্কে দুর্জয়-৭১ নামক ভাস্কর্যের উদ্যোক্তা।

পাকিস্তানি বাহিনী ২৬শে মার্চ সকাল থেকে খুলনা শহরে কনভয় যোগে শহরে টহল দিতে শুরু করলে বিপ্লবী পরিষদের সদর দপ্তর খানজাহান আলী রোড থেকে পূর্ব রূপসায় স্থানান্তর করা হয়। রূপসা নদীর পূর্ব পাড়ে রেলস্টেশনের কাছে জাহানারা

মঞ্জিলে বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান অবস্থান নেয়। এখানেই গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প, এটাই জেলার প্রথম ক্যাম্প। জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান ও বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ কামরুজ্জামান টুকু ক্যাম্প পরিচালনা করতেন। এ ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ৪ঠা এপ্রিল গল্লামারীস্থ রেডিও পাকিস্তান, খুলনা কেন্দ্র দখলের জন্য যুদ্ধ করে। যুদ্ধের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ কামরুজ্জামান টুকু। অসহযোগ আন্দোলনের আগ থেকে রেডিও সেন্টারে পাকিস্তানি বাহিনী সেনা ছাউনি ফেলে। গল্লামারী যুদ্ধের অধিনায়ক সুবেদার মেজর জয়নুল আবেদিন, মোসলেম ও হাবিব শহিদ হন। গল্লামারীস্থ বেতার কেন্দ্র দখলের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যায়। ভারতের হাফলং ও দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) অধিনায়ক তোফায়েল আহমেদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শত্রু সেনাদের পরাজিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে যুদ্ধে অংশ নেয়। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা মুজিব বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন– বৃহত্তর খুলনা মুজিব বাহিনী প্রধান শেখ কামরুজ্জামান টুকু, জয় বাংলা বাহিনীর প্রধান শেখ আব্দুল কাইয়ুম, কলেজ ছাত্র সংসদের ভি.পি. শাহনেওয়াজ জামান চৌধুরী আজাদ, টিএম নিজানুল হক, মো. মনিরুজ্জামান মনি (পরবর্তীতে মেয়র, খুলনা সিটি করপোরেশন), মো. আব্দুল হালিম, মো. আবু জাফর, স. ম. আব্দুস সাত্তার, মো. কায়কোবাদ আলী, মো. আব্দুল্লাহ (শেখ হাসিনা সরকারের ধর্মমন্ত্রী), আনোয়ার হোসেন আনু (মুক্তিযুদ্ধে শহিদ), আব্দুল মান্নান (পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে শহিদ), মো. আবু জাফর, ইত্তেহাদুল হক, শেখ শাহাদাত হোসেন বাচ্চু, মুন্সি আইয়ুব হোসেন, শেখ মাহাতাব উদ্দিন, মোকলেছুর রহমান বাবলু, রবিউল ইসলাম খান চৌধুরী তিনু ও মেজর (অব.) শেখ জামশেদ হোসেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধারা খুলনা ও সাতক্ষীরার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে গল্লামারী বেতার কেন্দ্র, পাইকগাছা হাইস্কুল, বারোআড়িয়া, কপিলমুনি, লায়ন্স স্কুল, ভোমরা, পারুলিয়া, খানজিয়া ও কালীগঞ্জের যুদ্ধে অংশ নেন।

শহিদ আব্দুল মান্নান: এ কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আব্দুল মান্নান। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অংশ নিতেন মিছিল, মিটিং-এ। মার্চের শেষ দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। তিনি থাকতেন সাউথ সেন্ট্রাল রোডস্থ মসজিদে তৈয়েবার পেছনে। পাকিস্তানি বাহিনী শহরের বিভিন্ন স্থানে সেনা ছাউনি স্থাপনের পর নিজেকে নিরাপদ মনে না করে শহরতলীতে যেয়ে অবস্থান নেন। এক মাস বিভিন্ন সহপাঠীদের বাড়িতে অবস্থান করার পর মে মাসে ভারতে যেয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করেন। জুলাই মাসের শেষ দিকে পরিবার পরিজনকে দেখতে সাউথ সেন্ট্রাল রোডস্থ বাড়িতে আসেন। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে কয়েকদিন আটকে রাখে। শারীরিকভাবে নির্যাতন করায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে হত্যা করে গল্লামারী ময়ুর নদের তীরে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার আসাদপুর গ্রামের মঙ্গল মিয়ার পুত্র তিনি। কমার্স কলেজে ব্যায়ামাগারের নামকরণ করা হয় আব্দুল মান্নানের নামানুসারে।

শহিদ আনোয়ার হোসেন আনু: খুলনা জেলায় সবচেয়ে বড়ো রাজাকার ক্যাম্প ছিল পাইকগাছা থানার কপিলমুনিতে। কপোতাক্ষ নদের তীরে কপিলমুনি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এ বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থানে রায় সাহেব বিনোদ বিহারীর পরিত্যক্ত বাড়িতে শান্তি কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে রাজাকার ক্যাম্প। ৬ই ডিসেম্বর যশোর সেনানিবাসের পতনের পরও কপিলমুনি বাজারের রাজাকাররা আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। মিত্রবাহিনীর কয়েকটি গ্রুপ সাতক্ষীরা ও যশোরের মুক্তাঞ্চলে অবস্থান করে। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের পরাজিত করার পর মুক্তিযোদ্ধারা কপিলমুনি ক্যাম্প দখলের পরিকল্পনা করে। রাজাকার ক্যাম্প দখলের জন্য দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয় ৪ঠা ডিসেম্বর। যুদ্ধের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বৃহত্তর খুলনা মুজিব বাহিনীর প্রধান শেখ কামরুজ্জামান টুকু। কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নৌ কমান্ডার গাজী রহমতুল্লাহ দাদু বীর প্রতীক। ৭ই ডিসেম্বর রাজাকার ক্যাম্পের পতন হয়। যুদ্ধে তিনজন শহিদ হন। তার মধ্যে একজন কমার্স কলেজের ছাত্র আনোয়ার হোসেন আনু। ১৯৭১ সালে তিনি বি.কম শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ছাত্রলীগের নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। খুলনার রূপসা থানার মুছাব্বরপুর গ্রামের শেখ মিরাজউদ্দিনের পুত্র। সবুরুন্নেছা তাঁর মা। প্রথমে তালা থানার শাহাজাতপুর গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী রূপসা থানার মুছাব্বরপুর গ্রামে পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, ২৬শে মার্চের পরদিন খুলনা নগরীর শিল্প শহর খালিশপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ভারতের টেন্ডুয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বিজয়ের পর ক্যাম্প: ১৭ই ডিসেম্বর খুলনা মুক্ত হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা খুলনায় আসতে শুরু করে। বৃহত্তর খুলনা মুজিব বাহিনীর প্রধান শেখ কামরুজ্জামান টুকুর তত্ত্বাবধানে কমার্স কলেজে ক্যাম্প স্থাপন হয়। এখানে পাঁচশো মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেয়। ৩১শে জানুয়ারি ঢাকায় স্বাধীনতার স্থপতি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেন। তারপর যাঁর যাঁর কর্মস্থলে ফিরে যায়। বিধ্বস্ত খুলনা শহরের পুনর্বাসনের জন্য ভারতের 'আনন্দ মার্গী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ কলেজে এসে অবস্থান করে। তাঁরা মার্চ পর্যন্ত খুলনা শহরে পুনর্বাসনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তথ্যসূত্র

* ড. শেখ গাউস মিয়া রচিত *বৃহত্তর খুলনা: আলোকিত মানুষের সন্ধানে।*
* স.ম. বাবর আলী রচিত *স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান।*
* গৌরাঙ্গ নন্দী রচিত *বৃহত্তর খুলনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।*
* বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবু জাফর রচিত *মুজিব বাহিনী খুলনা জেলা একাত্তর।*
* প্রফেসর এস. এ হাসিবের সাক্ষাৎকার।
* প্রাক্তন শিক্ষার্থী আব্দুস সবুরের সাক্ষাৎকার।
* জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মো. আবু জাফরের সাক্ষাৎকার।

কাজী মোতাহার রহমান: সাবেক সাধারণ সম্পাদক, খুলনা প্রেসক্লাব ও নির্বাহী সম্পাদক, খুলনা গেজেট

মেয়েটির খুব বদনাম ছিল

রফিকুর রশীদ

মেয়েটির খুব বদনাম ছিল।

আমাদের এই দেশে তো মেয়েদের বদনাম রটনার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু হয় না। জন্ম থেকেই শুরু হয় বদনাম দিয়ে। গর্ভবতী মায়ের কন্যাসন্তান দানকে কে কবে হৃষ্টচিত্তে নিতে পেরেছে! সবাই ঠোঁট উলটে বলেছে, 'অমুকের মেয়ে হয়েছে'। মেয়ে হওয়াটাই বড়ো বদনাম। তারপর থেকে পায়ে পায়ে বদনাম তার। একটুখানি বড়ো হয়ে ওঠার পর পান থেকে চুন খসলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ চোখ কপালে তুলে রে রে করে তেড়ে ওঠে– 'ছি ছি, অতখানি সেয়ানা মেয়ে...।'

মেয়েটির বদনাম ছিল একেবারে গোড়া থেকেই। ছোটোবেলায় মা-বাবাকে খুব জ্বালিয়েছে। মানব শিশুর পক্ষে যত প্রকারের জ্বালাতন করা সম্ভব, তার একটা দিকও সে বাদ রাখেনি। ভয়ানক ডানপিটে দুর্দান্ত ডাকাবুকো। পাড়ার এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের সঙ্গে হইচই করতে করতে তার বেড়ে ওঠা। দু'তিন বছরের ছোটো কিংবা বড়ো হলেও ক্ষতি নেই, সবার সঙ্গে তুইতোকারি, সবার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। যে বয়সে মেয়েরা পুতুলখেলা কিংবা ঘরকন্নার নকল খেলায় মত্ত থাকে, এই মেয়েটি সেই বয়সে পছন্দ করত– গুলতি হাতে গাছের ডালে পাখি শিকার করা অথবা নাটাই হাতে নদীর ধারে ঘুড়ি ওড়ানো। ঘুড়ির লড়াইয়ে তার খুব আনন্দ। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করে গোত্তা লাগিয়ে দিলে কিংবা ঘুড়ির সুতো কেটে দিলে রক্ষা নেই, ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে আসবে সে, তীব্র আক্রমণে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। এত যে দুরন্তপনা, তবু তার ভেতরে কী যেন এক অব্যাখ্যেয় মায়ামমতার জাদু ছিল, কেউ তার উপরে রাগ করে থাকতে পারত না। সকাল হবার সাথে সাথে সবাই আবার মিলেমিশে একাকার। তবুও মেয়েটির খুব বদনাম ছিল।

গ্রামের প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে মেয়েটি যখন এ নদীর ওপারে শহরের হাইস্কুলে ভর্তি হয়, তখন রাজ্যের সমুদয় বদনামও সেই নতুন স্কুলের দরজায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। বলা যায়, সশরীরে সে পৌঁছুনোর আগেই তার নামের সঙ্গে লেপ্টে থাকা বদনামগুলো হুটোপুটি করে পাল্লা দিয়ে পৌঁছে যায়। সে স্কুলে যাবার পর বেশ কটা পরিচিত মুখের দেখা পায়, তারা আগেই এসে ভর্তি হয়েছে, যেনবা এই বিশেষ বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই তাদের

এই আগেভাগে আসা। নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধু জুটতেও দেরি হয় না। বলতে দ্বিধা নেই, এই নতুন স্কুলেও মেয়েবন্ধুর চেয়ে তার ছেলেবন্ধু জুটে যায় বেশি সংখ্যায়। অল্পদিনেই তারা আসর গুলজার করে ফ্যালে বিশাল বন্ধুসার্কেলের মধ্যে। তাদের প্রাণখোলা হইচই-আনন্দ-উচ্ছ্বাসে একটুখানি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন স্কুলের গেম স্যার, সবচেয়ে তরুণ শিক্ষক আবুল মাসুদ মিন্টু স্যার। ও বাবা! নিয়ন্ত্রণ করবেন কী, দিনে দিনে তিনিও দিব্যি যুক্ত হয়ে পড়েন তাদের বৃত্তে, মেতে ওঠেন নানারকম খেলাধুলা নিয়ে, ইন্টার-স্কুল স্পোর্টসে লড়তে যান, সব মিলিয়ে অন্যরকম ব্যাপার-স্যাপার। খেলাধুলায় স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু মেয়েটির বদনামের কোনো তারতম্য হয় না।

দিন যত যায় তার বদনামের গায়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, নতুন রং ধরে। মানুষের মুখে মুখে নানান প্রশ্ন নানান কৌতূহল; তাতে তার কিছুই যায় আসে না। তাদের গ্রাম থেকে শহরের স্কুলে যাওয়া-আসার পথে নদী পার হবার খেয়াঘাট আছে দুটো। অধিকাংশ মানুষ যায় থানাঘাট হয়ে, সে যাবে যাদবপুর ঘাট হয়ে। স্কুলে যাবার আগে সেও যাবে থানাঘাট হয়ে, ফেরার সময় সে আসবে যাদবপুর ঘাট হয়ে। কেন, কী আছে ওই ঘাটে? সহযাত্রী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ চেপে ধরলে অবলীলায় সে জানায়– বাঁশিওয়ালা আছে।

বাঁশিওয়ালা! সে আবার কে? অনেকেরই চোখ কপালে–থাকে কোথায়?

আছে, আছে। সে রহস্য করে।

কারও কারও খুবই কৌতূহল, কী নাম সেই বাঁশিওয়ালার?

কিছুতেই সে গিট খোলে না, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে,

নাম তো জানিনে, শুধু তার বাঁশি শুনেছি।

একজন বলেই ফ্যালে,

বাব্বা! তুই কি তার প্রেমে পড়েছিস?

খিলখিলানো হাসিতে সে শিউলি ঝরিয়ে দেয়। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা ওই বয়সে বুঝে ওঠার কথা নয়, তবে আকাশকুসুম কল্পনা এবং কৌতূহল যথেষ্ট আছে। লজ্জা-দ্বিধা আছে তারচেয়ে বেশি। তবু সে দিব্যি জানায়,

না না, প্রেমে পড়তে এখনও ঢের দেরি আছে।

শেষে দুজন গোয়েন্দা প্রকাশ্যেই তার পিছু নেয়, থানাঘাটের বদলে তারাও চলে আসে যাদবপুর ঘাটে। রহস্যের কিছুই কিনারা হয় না। সেই এক বাদল পাটনির খেয়া নৌকায় পারাপার। নদীর পাড়ে বটতলায় সাপ খেলার ঝাঁপি নিয়ে আসর বসিয়েছে এক সাপুড়ে। লোকজন গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে, শোনা যাচ্ছে ডুগডুগির বাজনা, কে যেন ভাঙা গলায় গান গাইছে–

'খা খা বক্ষিলারে খা ...।' কিন্তু সে বাঁশি কোথায় !

বেশ কয়েক মাস নিবিড় অনুসন্ধানের পর গোয়েন্দাদের একজন আবিষ্কার করে বাঁশিওয়ালা আর কেউ নয়, বাদল পাটনির ছেলে রতনের মাথায় সুরের খেয়াল চাপলে একাকী বাঁশি বাজায়। বড্ড খেয়ালি মানুষ। ইচ্ছে হলে বটতলায় বসে যায় বাঁশি হাতে, আবার ইচ্ছে হলেই উধাও। কোথায় যায়, কোথায় থাকে, সে খবর বাড়ির লোকও জানে না ঠিকঠাক। মাইল দুয়েক পশ্চিমে হরিণবাঁধা মাঠ পেরোলেই ভারতীয় সীমানা, অনেকের ধারণা– রতন গোপনে ইন্ডিয়ায় যায় ওস্তাদের কাছে বাঁশির তালিম নিতে।

মেয়েটির বদনাম হবে না কেন, ওইটুকু বয়সে রতনের বাঁশি শুনে এভাবে মজে যাবার কোনো মানে হয়! আবার হাজার শুধালেও সে কথা স্বীকার করবে না সে। গোপন করতে গেলেই তো মানুষের সন্দেহ বাড়ে। সেই সন্দেহের কথা শুনে হি হি করে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে, দুহাত নেড়ে জানায়, রতন নামের কাউকে নাকি সে চেনেই না। তার বদনামের ডালপালা বর্ষাকালের গাছগাছালির মতো অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে, ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত। নইলে ক্লাস সেভেনের ধাপ পেরোতে না পেরোতেই সবার প্রিয় গেম স্যারকে জড়িয়ে এমন উলটাপালটা বদনাম কেন রটতে যাবে! স্কুলে কি আর কোনো মেয়ে নেই! বলতে গেলে প্রতিটি ক্লাসেই তার চেয়ে রূপবতী একাধিক ছাত্রী আছে। কই, তাদের নামে তো এমন বিশ্রী ইঙ্গিত কেউ কখনও করে না! কমনরুমের দেয়ালে গেম স্যারের নামের সঙ্গে যোগচিহ্ন দিয়ে আর কারও নাম লেখা হয় না, লেখা হয় সেই একজনেরই নাম। যে-ই লিখুক চক দিয়ে, কেন লেখে? প্রায় ভিত্তিহীন সন্দেহের বশে হেডস্যার এ জন্যে ক্লাস নাইনের কামরুলকে বেদম প্রহার করেন।

বেতের ঘায়ে বেচারার পিঠের চামড়ায় রক্ত ফুটে বেরোয়, কিন্তু এ অপরাধের দায় সে মোটেই কবুল করে না। কামরুলকে সন্দেহ করার ছোট্ট একটি সূত্র অবশ্য ছিল। কবে নাকি বইয়ের ভাঁজে ছোট্ট একটি চিরকুট সে চালান করেছিল এবং সে চিরকুট ধরাও পড়েছিল স্যারদের কাছে। তবে কি সেই জন্যে কমনরুমের দেয়ালে এই মেয়েটির নামের পাশে যোগ চিহ্ন দিয়ে সে গেম স্যারের নাম লিখতে যাবে! কী যে অদ্ভুত যুক্তির ধারা! যাকে নিয়ে এত সব ঘটনা, সেই মেয়েটি কিন্তু একেবারেই নির্বিকার, ভাবলেশহীন।

এত সব বদনামের পাক-পঙ্কিলতার মধ্য দিয়েই মেয়েটির বেড়ে ওঠা। তার মা-বাবা গ্রামের সাধারণ মানুষ, মেয়ের বদনামের তপ্ত হাওয়া তাদের গায়েও লাগে। কানে আঙুল দিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়, কতদিন! সকল বদনামকে মাটি চাপা দিতে তারা মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কানে কানে সে বার্তা রটেও যায় চারদিকে।

সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। চোখে রং ধরার বয়স। আকাশে ডিগবাজি মেরে বলিষ্ঠ নক্ষত্রকে ছুঁয়ে দেখার সময়। গার্জেন বললেই গুটিসুটি মেরে বিয়ের পিঁড়িতে বসার পাত্রী তো সে নয়। হাত-পা ছুড়ে তো দেখতেই চাইবে। তার দাবি অবশ্য বেশি কিছু নয়। অন্তত পক্ষে স্কুল ফাইনালে অংশ গ্রহণের সুযোগ চায়। তারপর নার্সিং পড়ার আকাঙ্ক্ষা। মানব সেবার মহৎ পেশা হিসেবে নার্সিং সম্পর্কে বিশদ কিছু জানার অবকাশ গ্রামের মেয়েদের হবার কথা নয়। কিন্তু তার সে সুযোগ হয়েছিল। তার মায়ের দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় টানা সাতদিন মায়ের সঙ্গে হাসপাতালবাসের সময় খুব কাছে থেকে নার্সদের কার্যকলাপ সে দেখতে পায়। তখন থেকেই তার সাদা পোশাকের ফুলপরি হওয়ার সাধ জাগে।

সব সাধ কবে পূরণ হয়েছে কার! তাহলে তো অপ্রাপ্তি বা অতৃপ্তি বলে কিছুই থাকত না! আর যে মেয়ের পায়ে পায়ে বদনামের বেড়ি, তার ইচ্ছের মূল্য দেবে কে? কাজেই বিয়ের কথা বহাল রইল। পরপর দুটো প্রস্তাবও জুটে গেল বেশ। পাশের গ্রাম রাজাপুরের মান্নান প্রতিদিন নদীর ওপারে শহরে গিয়ে বিরাট এক কাপড়ের দোকানে দর্জির কাজ করে। তার পৈতৃক অবস্থা ভালো না হলেও বর্তমান আয়-ইনকাম মোটেই খারাপ কিছু নয়। ঘটককে সে জানিয়েছে পথ চলতে চলতে এই মেয়েকে অনেকবার দেখেছে, নতুন করে দেখাশোনার কিছু নেই; গার্জেন রাজি থাকলে অল্প দিনের মধ্যেই বিয়ে করতে চায়। এ প্রস্তাবে পাত্রীপক্ষের আপত্তি নেই বললেই চলে। তবু বিয়ে বলে কথা, ভাবনাচিন্তার জন্যে একটু সময় নেওয়া হয়। আর তাতেই বাঁধে গেরো।

থানাঘাটে খেয়া পারাপারের সময় থানার এক অল্প বয়সি পুলিশের সঙ্গে নাকি এই মেয়ের পরিচয় এবং প্রণয় পর্যন্ত হয়েছে। থানাঘাট এড়িয়ে মেয়েটি যেদিন যাদবপুর ঘাটে খেয়াপার হয়, সেদিন এই পুলিশটিও মোটরসাইকেল হাকিয়ে চলে যায় যাদবপুর মোড়ে। অনেকে তাদের কথাবার্তা বলতেও দেখেছে। গায়ে পুলিশের পোশাক দেখে কেউ মুখ খোলার সাহস দেখায়নি। সেই পুলিশও বিয়ে করতে চায় মেয়েটিকে। বর্তমান স্টেশন থেকে তার বদলির কথা চলছে, সেই অর্ডারটা হাতে এলেই সে বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে নতুন কর্মস্থলে, সেখানেই বাসা বাঁধবে। চাকরিজীবী জামাই পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা। তাও কি না পুলিশের চাকরি। 'মাছের মধ্যে ইলিশ, আর চাকরির মধ্যে পুলিশ' –সেরা এ কথা কে না জানে! মেয়েটির বাবা যখন এ নিয়ে গভীর চিন্তিত। সেই সময়ে শহর থেকে স্কুলের গেম স্যার সাইকেল ঠেলে এক সন্ধ্যায় জানতে আসেন তার ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছে না কেন? সামনে অ্যানুয়াল স্পোর্টস যে!

প্রিয় স্যারকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি। আকুল আবদার জানায় সে,

আমাকে বাঁচান স্যার।

ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে অবলম্বন হিসেবে, মেয়েটির হয়েছে সেই দশা। সে হড়বড় করে জানায়,

আমার বিয়ে দিয়ে দেবে স্যার। স্কুলে যেতে দেবে না।

মেয়েটির বাবাও সহসা গেম স্যারকে আঁকড়ে ধরে। মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠছে, কাজেই মেয়ের বিয়ে দোওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় সে দেখছে না। এখন তার মুশকিল দুই দিকের দুই পাত্র নিয়ে। সে পরামর্শ চায় গেম স্যারের কাছে – এখন তার কী করণীয়! কোনদিকে যাবে সে!

মনে মনে হাসেন গেম স্যার। তার পরামর্শ কি আদৌ নেবে এই লোকটি! মাথায় ঢুকেছে মেয়ের বিয়ের ভূত। সেই ভূতের হাত থেকে তার রক্ষা নেই। স্কুলের শিক্ষক তার ছাত্রীকে স্কুলে যেতে বলবে, পড়াশোনা করতে বলবে–সব সমস্যার সমাধান খুঁজবে এই ফর্মুলার মধ্যে; কিন্তু এসব তার ভালো লাগবে কেন! ভালো লাগবে না জেনেও গেম স্যার দুম করে বলেই ফেলেন,

মেয়ে নিয়মিত স্কুলে গেলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

বাবার মুখে ফুটে ওঠে আতঙ্ক,

খেয়াঘাট থেকে যদি পুলিশে থাবা মেরে তুলে নিয়ে যায় মেয়েকে?

এতক্ষণে আচানক তথ্য জানায় মেয়েটি। থানার ওই পুলিশের সঙ্গে তার নাকি কোনো প্রকার সম্পর্কই নেই। শুধু একদিন সে পথ আগলে নাম-ধাম জানতে চেয়েছিল, এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু বদনামের বেড়ি যার পায়ে বাঁধা, সে যাবে কত দূর! যেখানে যাবে, যত দূরে যাবে, বদনাম তার সঙ্গেই যাবে। 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'র দশা যেমন, অনেকটা সেই রকম। যে পথে যাবে সে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতেই যাবে। শৈশব থেকেই মেয়েটির খুব বদনাম ছিল, যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিতে না দিতেই তার পা হড়কাবে এতে আর অবাক হবার কী আছে! বদনাম তো রটবেই, যার যা মুখে আসবে তাই সে রটিয়ে দেবে, তার মুখে হাত দিতে যাবে কে! জ্বলন্ত উনুনের মুখে হাত দেবার চেয়ে সেটা শক্ত কাজ। সে কাজ সহসা কেউ করতে যায়! কাজেই বদনামের আগুন চৈত্রী বাতাসে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়াতেই থাকে।

মেয়েটির বিয়ের ঘটনা নিয়ে কত যে রহস্য আর বদনাম হাত ধরাধরি করে দ্রুত পায়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার কোনো হিসেবনিকেশ নেই। আগ্রহী দুই পাত্রের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচার বিবেচনা করে তার বাবা যখন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে, তখনই বদনামের বড়ো বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। শোনা গেল স্কুলে যাবার নাম করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সে আর বাড়ি ফেরেনি। বিয়ের আগে স্কুলে যাওয়া কেন? কী দরকার স্কুলে? মা-বাবার ওপরে খুব জোর খাটিয়েছে, কাঁদাকাটি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি– কিছুই বাদ নেই। অবশেষে বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এই শেষবারের মতো স্কুলে যাবে, আবার বিকেল নাগাদ ঠিক ফিরে আসবে। কিন্তু না, সে আর বাড়ি ফেরেনি।

এইবার বদনামের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। বদনাম রটনার কাজে মানুষের কল্পনাশক্তি যে কতটা প্রখর আর সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে, তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল এই মেয়েটির নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে। গোভীপুরের স্বভাবকবি ইনসার উদ্দিন এই ঘটনা নিয়ে পয়ার ছন্দের কবিতাও লিখে ফ্যালে দু'পাতা। হাটে-মাঠে-ঘাটে গ্রাম্য সেই কবিতা তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তাও লাভ করে। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটির কোনো সন্ধান-সুতো কেউ আবিষ্কার করতে পারে না। তাদের স্কুলের কেউ তাকে দেখেনি সেদিন, কোনো ছাত্রছাত্রীর নজরেই পড়েনি ; গেম স্যার তো আকাশ থেকে পড়ার মতো অবাক হন। নিজ উদ্যোগে ছুটে যান থানায়, অন্যতম আগ্রহী পাত্র সেই পুলিশটির সঙ্গে কথা বলেন; কোনো কাজ হয় না। থানায় ডায়েরি করার পরামর্শ দিয়ে সে গেম স্যারকে বিদায় করে। কী আশ্চর্য ঘটনা– একজন মানুষ এ চরাচর থেকে উধাও হয়ে গেল দিবালোকে, কেউ জানবে না কোনো খবর! স্কুলে সে যাক বা না যাক, স্কুলের নাম করেই তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে! থানাঘাট বা যাদবপুর ঘাটের পারানি-পাটনি কেউ কিছু বলতে পারে না। দু'জনের কেউ নাকি তাকে সারা দিনে দেখেইনি। কান কথার ওপর ভর করে বাদল পাটনির ছেলে বাঁশিওয়ালা রতনেরও খোঁজখবর সংগ্রহ করা হয়। না, সে বাড়ি নেই। সাতদিন আগে বাঁশি হাতে কোথায় যে গেছে, কেউ সে কথা জানে না। সাতদিন আগেই উধাও! সময়ের সঙ্গে সমন্বয় হয় না।

দু-তিন মাস পরে কোথা থেকে কীভাবে যেন খবর ভেসে আসে– নিরুদ্দিষ্ট এই মেয়েটিকে দেখা গেছে দর্শনায়, রেলবাজারে। সে রিকশায় চেপে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে কেউ ছিল না? এবার সংবাদদাতা আরও অবাক করা তথ্য জানায়। তার সঙ্গে নাকি মোশতাক বিহারির ছেলে মনজিলকে দেখা গেছে। অনেকে তাকে নাদিম বলেও ডাকে। উর্দু ছবির নায়ক নাদিমের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যের কারণে মুখে মুখে এই নামকরণ হয়েছে তার। স্কুলের গণ্ডি পেরুনোর আগেই লেখাপড়ার পাট গুটিয়ে বাবার ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। মোশতাক বিহারি দর্শনার কেরু কোম্পানির সুগারমিলে মেকানিকের কাজ করেছে জীবনের অর্ধেকটা সময়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গোলমাল করে চাকরি ছেড়ে সে চলে আসে মেহেরপুরে, বড়োভাই মোহাম্মদ কসাইয়ের কাছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে সংসার বাধঁলেও সে ভাইয়ের পেশা গ্রহণ করেনি। বড়ো বাজারের এক গলির মধ্যে ইলেকট্রিকের দোকান দিয়ে বসেছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বিক্রির পাশাপাশি সেলাইকল, পাওয়ার টিলার, হ্যাজাক লাইট প্রভৃতি যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজও সে খুব যত্নের সঙ্গে করে। মেকানিক হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে মনজিলকে সে হাতে ধরে এই কাজ শেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু কালিঝুলি মাখা কাজে ছেলের বড়োই আপত্তি। নায়ক নাদিমের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কারের পর মিস্তিরিগিরি কি ভালো লাগে! তবে

সে মাঝেমধ্যে দোকানে বসে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রির কাজে বাবাকে সহযোগিতা করে। তা সেই মনজিল ওরফে নাদিমের সঙ্গে ভৈরবপারের গ্রাম গোভীপুরের এই সাধারণ মেয়েটির সম্পর্ক কী! অঙ্ক মেলে না কিছুতেই। প্রত্যক্ষদর্শী জোর দিয়ে বললে মেয়েটির বাবা তখন কী করে! প্রবাদ আছে– 'গরু হারালে শোকার্ত কৃষক নাকি কলসের মধ্যেও গরু খোঁজে।' কন্যাহারা বাবারও তো সেই একই দশা। অল্প কয়েক ঘর বিহারির বাস আছে বটে মেহেরপুরে, তাদের কারও সঙ্গে জানাশোনা নেই তার, মনজিলের খবর সে পাবে কেমন করে!

এর- ওর মাধ্যমে নানান ডালপালা ধরে মোশতাক বিহারির কাছে পৌঁছানোর পর জানা গেল, মনজিল গেছে সৈয়দপুরে, মেজো খালার বাড়ি।

সৈয়দপুরে তার খালাবাড়ি হতেই পারে, সেখানে বিহারিদের বিরাট আস্তানা,

অনেক প্রভাব। ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, এখান থেকে মনজিল গেল কবে?

মোশতাক বিহারি চোখ পিটপিট করে তাকায়। তার চোখের উপরের ভুরু জোড়া সজারু কাঁটার মতো নড়ে ওঠে। কোনো উত্তর দেয় না।

সেদিন কি সোমবার ছিল?

দুআঙুলের ফাঁকের জ্বলন্ত সিগারেটে জোরে দম কষে মোশতাক বিহারি উলটো প্রশ্ন করে,

কী ব্যপার বোলো তো!

সত্যিকারের ব্যাপারটা যে কী, কেন এই খোঁজাখুঁজি সে কথা আর খোলাসা করে বলা হয় না। তবে কথার ফাঁকে জানা যায় দর্শনায় মনজিলের মামাবাড়ি, তারই মামাতো ভাই অবাঙালি হয়েও ছাত্রলীগের রাজনীতি করে, জয় বাংলা বলে স্লোগান দেয়। এই সব নিয়ে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক পারিবারিক বিরোধ আছে, অশান্তি আছে।

কাজেই মনজিলের পক্ষে দর্শনায় যাবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

মেয়েটির নামের সঙ্গে আরও অনেক বদনাম যুক্ত হতে তখনও বাকি। এত শিগগিরই তাকে খুঁজে পেলে চলবে কেন! দেশে তখন চরম উত্তেজনা। সামনে ভোট। বহু প্রতীক্ষিত এবং প্রত্যাশিত সাধারণ নির্বাচন। গোটা বাঙালি জাতি মেতে উঠেছে নির্বাচনি ডামাডোলে। ছাত্র-যুবকেরা লেখাপড়া, এমনকি খেলাধুলার চেয়ে বড়ো করে দেখছে এই নির্বাচনকে। অফিস-আদালতের অফিসার-কেরানি-উকিল পর্যন্ত ফাইলের কাজের চেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে নির্বাচনকে। কলকারখানার শ্রমিক এবং ছোটো-বড়ো ব্যবসায়ীরাও রাস্তায় নেমে এসেছে নির্বাচনের জন্যে। গ্রামগঞ্জের কৃষক-তাঁতি-জেলে সবাই ভাসছে নির্বাচনি হাওয়ায়। সবার বুকে আশা-ভরসার বাতি জ্বালিয়েছেন প্রিয় নেতা শেখ মুজিব। সবার প্রিয় বঙ্গবন্ধু। মিথ্যে মামলায় সরকার তাঁকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। এদেশের ছাত্র-জনতা রুখে দিয়েছে সেই অপচেষ্টা। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে মওলানা ভাসানী ঘোষণা দিয়েছে–'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'। সারা জাতির বুকের ভেতরে সেই তালা ভাঙা আবেগ টগবগ করে ফুটছে, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তারা স্বৈরাচারী সরকারকে দাঁতভাঙা জবাব দিতে চায়। নির্বাচনি প্রচারণার প্রবল জোয়ারে গোভীপুর গ্রামের ঘরপালানো মেয়েটির কেচ্ছাকাহিনি এক রকম আড়ালে চাপা পড়ে যায়। এমনকি স্বভাবকবি ইনসার উদ্দিনও তার জনপ্রিয় পয়ার ছেড়ে জনগণের প্রত্যাশার ভাষা অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচন এবং আশাভরসার প্রতীক নৌকা মার্কা নিয়ে নিত্যনতুন গান বেঁধে যাদবপুর ঘাটের বটতলায় দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ছড়িয়ে চলেছে। মানুষ সেই গান মুখে মুখে বয়ে নিয়ে চলেছে গ্রাম-গ্রামান্তরে, পথে- প্রান্তরে।

তবে বদনামেরও নিজস্ব একটা ধর্ম আছে, নিঃশেষে নিভে যায় না, ঘুঁটের আগুনের মতো দৃশ্যমানতার আড়ালে ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকে। পেট গুড়গুড়ি রোগের মতো, ভালো আছে ভালো আছে, কখন যে নিম্নগামী বেগ এসে ফাঁসিয়ে দেবে সে কথা বলা মুশকিল। সর্বদা বদনামের সঙ্গে বসবাস করা মেয়েটির ক্ষেত্রেও তা-ই হলো। রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং নির্বাচনি ডামাডোলে সবাই যখন মহাব্যস্ত, অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ কারও নেই, তারই মধ্যে নির্বিরোধী এক ব্যক্তি সহসা একদিন অতিশয় নির্দোষ ভঙ্গিতে দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমার ঢাকনা আলগা করে দেয়। বলব না বলব না ভাব দেখালেও অতি কৌশলে সে কুৎসিত কথাটি ঠিক পরিকল্পনামতো ছড়িয়ে দেয়। সে নাকি ঢাকা থেকে ফেরার পথে গোয়ালন্দ ঘাটে নাকি দৌলতদিয়ায় ঘরপালানো এই গ্রামের মেয়েটিকে দেখেছে। একই গ্রামে জন্ম, বেড়ে ওঠা, তার দেখায় কোনো ভুল নেই। এখন বেশ স্বাস্থ্যবতী হয়েছে, ঢলো ঢলো লাবণ্যমাখা চেহারা। গ্রামের ইজ্জতের কথা ভেবেই এ কথা প্রকাশ করতে তার খুব দ্বিধা যে মেয়েটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, সে এখন নিষিদ্ধ পল্লির বাসিন্দা।

সত্যি সে এক আশ্চর্য সময় এসেছিল আমাদের এই চরাচরে। নির্বাচনের আর কয়েক দিন বাকি, বঙ্গোপসাগরের রাক্ষুসী জলোচ্ছ্বাস অকস্মাৎ দক্ষিণাঞ্চলের লাখো মানুষকে গিলে খেয়েছে, তবু সবার মুখে মুখে নির্বাচনি আলোচনাই চলছে, এর বাইরে অন্য কিছু শুনতে কেউ রাজি নয়। ফলে গোভীপুর গ্রামের মানুষ মুখরোচক দিল্লির লাড্ডু হাতে পেয়েও সেদিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ পায় না। সে কারণে এত বড়ো বদনামটা পিঠের উপরে চাপিয়ে দেবার পরও সেটা সেই মেয়েটির গায়ে মাখে না, সময়ের স্রোতে ভেসে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়।

অথচ মেয়েটির খুব বদনাম ছিল সেটাই সত্যি।

সীমাহীন বদনামের অথই বেনোজলে নিমজ্জিত এবং দেশের উথালপাথাল রাজনৈতিক ঢেউয়ের তোড়ে বিস্মৃতপ্রায় মেয়েটিকে অনেকদিন পর পাওয়া গেল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত শহর মেহেরপুরেই। ততদিনে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সারা দেশে, বাঙালির মুক্তির যুদ্ধ। পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্রের জোরে দখল করে আছে গোটা দেশ। তারা ছড়িয়ে পড়েছে এদেশের শহর-নগর-গ্রামে। মেহেরপুরেও তারা আস্তানা গেড়েছে নজরুল স্কুল, ভোকেশনাল এবং কলেজে।

প্রতিদিন অভিযানে যায় গ্রামে গ্রামে, সঙ্গে থাকে এ দেশীয় রাজাকার ও বিহারি; হত্যা অগ্নিসংযোগ-লুটপাট-নারীনিগ্রহ তাদের নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অত্যাচারে ভৈরবের পশ্চিম পাড়ের গ্রাম গোভীপুর-যাদবপুর-রাজাপুর-রাধাকান্তপুর জনশূন্য হয়ে পড়েছে। অগ্নিদগ্ধ বসতভিটে ছেড়ে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সীমান্তের ওপারে।

মেহেরপুর তখনও গ্রামের আঁচল সরিয়ে ফেলে পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠেনি, তার শরীর জোড়া গ্রাম্যতার ছাপ তখনও স্পষ্ট। ওয়াপদার মোড় থেকে কালিবাজার হয়ে কোর্টপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত মিউনিসিপ্যালিটির এইটুকু এলাকার মানুষজন সবাই সবার চেনাজানা। বাঙালি-বিহারি কী হিন্দু-মুসলমান, কেউ কার অচেনা নয় বললেই চলে। এরই মধ্যে গেরিলা যোদ্ধারা সীমান্ত পেরিয়ে

দেশের মধ্যে ঢুকছে, গ্রামে কিংবা শহরে তারা বাগে পেলে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করছে, দু'একটা রাজাকার ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজাও দিচ্ছে; তাই বলে মোশতাক বিহারির বাড়িতে হানা! পাকিস্তানি মেজরের সঙ্গে তার সখ্যতার কথা কে না জানে! নিজের ছেলে মনজিলকে শুধু নয়, দর্শনা-চুয়াডাঙা থেকে আরও বেশ কজন বিহারি যুবককে এখানে নিয়ে এসে বিশেষ ব্রিগেড গঠন করেছে। প্রথমে দোভাষীর দায়িত্ব নিয়ে এলেও এই ব্রিগেড অচিরেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো নিপীড়ক বাহিনী। মনজিল তাদের প্রধান। খোঁজ নিয়ে এসব তথ্য জেনেশুনেই কোনো এক শ্রাবণদিনে মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে মোশতাক বিহারির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধের শুরুতেই জরাজীর্ণ পুরাতন বাড়ি ত্যাগ করে সম্ভ্রান্ত এক হিন্দুর পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করেছে সে। শোনা যায়, স্বাধীন বাংলা বেতারের অভিনেতা বাবুয়া বোসের দ্বিতল প্রাসাদটি দখলে নেবার চেষ্টায় আছে মনজিল। হয়ত সে সফলও হবে অল্পদিনেই। সব দিকের খোঁজখবর নিয়ে একেবারে সময়মতো হাজির হয় কামরুল। ভাগ্যক্রমে মনজিলের স্ত্রী নিজেই ভিক্ষে দিতে আসে। গেরিলারা সময় নষ্ট করে না। তাদের থিওরি– হিট অ্যান্ড রান। গৃহকর্ত্রীর চোখে চোখ রেখে কামরুল ঝটপট বলে ফেলে,

কুসুম, আমি কামরুল।

গৃহকর্ত্রী আপাদমস্তক চমকে ওঠে, আগন্তুকের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলে,

কামরুল ভাই!

হ্যাঁ, ক্লাস নাইনের কামরুল।

তুমি এখানে?

একদিন আমি তোর জন্যে হেডস্যারের হাতে মার খেয়েছি, আজ আমার জন্যে তোকে ঝুঁকি নিতে হবে।

কুসুমের দু'চোখ কেঁপে ওঠে। তার কণ্ঠে স্ফুট হয় আর্তনাদ,

তোমার বিপদ হবে কামরুল ভাই। তুমি এখান থেকে যাও।

কামরুল বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে ওঠে,

তুইও কি বিহারি হয়ে গেছিস কুসুম?

দু'চোখ ছলছল করে ওঠে কুসুমের, বুঝিবা একটুখানি ফুঁপিয়েও ওঠে সে। কামরুল আশ্বস্ত করে,

ভয় নেই, তোর স্বামীকে মারতে আসিনি। আমরা যুদ্ধ করছি দেশের জন্যে। দেশের কথা ভেবে তুইও আমাদের সহযোগিতা করবি কুসুম।

আমি কোথায় যাব বলতে পার কামরুল ভাই! আমার তো মা-বাপ কেউ নেই। কোথায় যাব আমি?

গোভীপুর অপারেশনের দিন গ্রামের আরও পনেরো জন নিরীহ মানুষের সঙ্গে কুসুমের মা-বাবাকেও হত্যা করে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা। সে খবর তাহলে কুসুমের কানেও পৌঁছেছে! মুখটা নামিয়ে কামরুল বলে,

তুই এখানেই থাক কুসুম। এখান থেকেই আমাদের সহযোগিতা করবি। আর্মির গতিবিধির খবর সংগ্রহ করে দিবি।

কুসুম এতটাই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা ভুলে সে খপ করে হাত চেপে ধরে কামরুলের, অদ্ভুত এক দাবি জানায়,

আমাকেও নিয়ে চলো ভাই। মেয়েমানুষ কি যুদ্ধ করে না?

কামরুল একটু গলা চড়িয়ে বলে,

হ্যাঁ, করে। কিন্তু তোর যুদ্ধ এখানেই। আমি আবার আসব ইনফরমেশন নিতে। তোকে খুব দরকার হবে বোন।

আর একটুও দাঁড়ায় না কামরুল। ভিক্ষের ঝুলি টেনেটুনে ঠিকঠাক করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তার কানের দরজায় লেপ্টে থাকে কুসুমের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর– 'আমাকেও নিয়ে চলো ভাই!'

মাথার উপরে শ্রাবণ আকাশ নুয়ে আছে মেঘভারে। যে-কোনো মুহূর্তে নামতে পারে বৃষ্টিধারা। তবু তাড়াহুড়ো করার কোনো উপায় নেই কামরুলের। সে এখন ন্যাংড়া ভিখিরি, জোর করে হাঁটলে তো চলবে না। নকল গোঁফ দাড়ির আড়াল থেকে কামরুলকে এতদিন পরে কুসুম এক ডাকেই চিনল কী করে! তবে কি তার ছদ্মবেশ নিখুঁত হয়নি? নাকি অতি সংগোপনে মনের কোনো নিভৃতে কোণে স্কুলজীবনের দুরন্তপনার স্মৃতি ধরে রেখেছে বলেই কামরুলকে চিনতে কুসুমের একটুও দেরি হয়নি! কত যে বদনামের বোঝা বয়ে চলেছে এই মেয়েটি! আজও কিন্তু জানা হয়নি– অবাঙালি মনজিল তাকে কব্জা করেছিল কোন মন্ত্রে! কেউ জানে না কুসুম সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর কেমন করে মনজিলের খপ্পরে পড়েছিল! ব্যাপারটার মধ্যে কতটা জবরদস্তি আর প্রতারণা ছিল, তাই বা কে জানে! নাকি নায়ক নাদিমের চেহারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কুসুম নিজেই সর্বনাশের অনলে ঝাঁপ দিয়েছিল! তার তো বদনামের সীমা-পরিসীমা ছিল না কখনোই।

সবাই জানে, মেয়েটির খুব বদনাম ছিল।

সে রাতে নিজস্ব শেল্টারে ফিরে আসার পর কামরুলের মনে হয়– একদিন কুসুমের গোয়েন্দাগিরি ধরা পড়ে যেতে পারে মনজিলের কাছে। তখন কি সে স্ত্রী বলে ক্ষমা করবে তাকে! নাকি ভেট হিসেবে তুলে দেবে পাকিস্তানি মেজরের খাসকামরায়? তখনও কি তার খুব বদনাম হবে? কী সেই বদনাম হতে পারে? কুসুম স্বেচ্ছায় আর্মি ক্যাম্পে গিয়েছিল মেজরকে দেহদান করতে? কেন, তা সে করতে যাবে কেন? কী স্বার্থ তার?

সবাই তখন এক কথায় বলবে, মেয়েটি চরিত্রহীন ছিল যে!

কামরুল পরের দফায় দেখা করতে গিয়ে কুসুমের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায়। দু'দিনের মধ্যে কবে কোন এলাকায় আর্মিদের অপারেশন আছে, কবে রেশনের গাড়ি মেহেরপুর থেকে বামুন্দি ভাটপাড়া ক্যাম্পে যাবে, এ সবেরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবু সে হুট করে জিগ্যেস করে বসে,

সত্যি তুই যুদ্ধে যাবি কুসুম?

কুসুম খুব স্থিরভাবে জানায়,

যুদ্ধের মধ্যেই তো আছি, এই যে তোমাদের সঙ্গে আছি।

কামরুল খুব অবাক হয়ে যায় উচ্চারণের এরকম স্বচ্ছতায়। এই তো মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই কুসুমের মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। কত সহজেই সে বলতে পারে,

বদনাম তো আমার হবেই জানি, তবু আমার যুদ্ধটা আমাকে করতে দাও। দালাল তো আমার সঙ্গেই আছে ভাই, ওই মেজর পর্যন্ত আমি একবার দেখতে চাই। এ জন্যে আমাকে একটা পিস্তল জোগাড় করে দিও।

মুজিবাদর্শের সূর্য সৈনিক শহিদ রূহুল ইসলাম ও তাঁর একগুচ্ছ একাত্তরের চিঠি

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

একাত্তরে আমার বয়স ছয়-সাত বছর হলেও বেশ কিছু জাজ্বল্যমান স্মৃতি এখনও রয়েছে যা আমি সারা জীবনেও বিস্মৃত হতে পারি না। তবে আমার ফুফাতো ভাই একেএম রূহুল ইসলাম সাদী, তাঁর কথাই কেন জানি বেশি বেশি মনে পড়ে। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন যেমন স্বাধীনতা, তেমনি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা। এ যেন চির সবুজের বুকে এক সাগর রক্তের আলপনা। কিন্তু যাঁরা তাঁদের বুকের তপ্ত রক্তে রাঙিয়ে তুলেছে রক্তিম পতাকা, তাঁদের কজনইবা এসেছে ইতিহাসের পাদপ্রদীপে? এভাবেই যুগে যুগে, দেশে-বিদেশে একঝাঁক নিভৃতচারী সেনানী রয়ে যায় ইতিহাস নামক পর্দার অন্তরালে। আমি আজ এমনই এক নিভৃতচারী, মুজিবাদর্শের সূর্য সৈনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই, যিনি তাঁর মেধা ও মননে ধারণ করেছেন বাংলা মাকে; এমনকি জীবন দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন বাংলার স্বাধীনতা, রক্তের আখরে লিখে গিয়েছেন স্বমহিমা। বর্তমান রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বয়রাট মাজাইল গ্রামের মুক্তিযুদ্ধের এই বীরসেনানীর নাম একেএম রূহুল ইসলাম, ডাকনাম সাদী। মা-বাবার ১১ সন্তানের মধ্যে [৮ পুত্র ও ৩ কন্যা] তিনি দ্বিতীয়। বড়ো ভাই একেএম আমিরুল ইসলাম হাদী ছিলেন তৎকালীন পিজি হাসপাতাল [বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়]-এর ক্যাশিয়ার। পাকিস্তান এয়ারফোর্সের এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার এই তরুণ অফিসার ইসলামাবাদ-লাহোর-করাচি কিংবা পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি থেকে আপনজনকে লেখা আবেগময় পত্রে পারিবারিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি দেশের কথা, দেশকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন অকপটে। সযত্নে সংরক্ষিত এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর লেখা একাত্তরের একগুচ্ছ মূল্যবান চিঠি নিয়ে দু'চার কথা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশবাসীর কাছে আমি তুলে ধরতে চাই। নিবন্ধকারের ফুফাতো ভাই এই বিমানসেনা ছিলেন ছিপছিপে লম্বা ও ভীষণ ফরসা। 'বিজয়ের আস্বাদ' নামের কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রাঞ্জল ভাষায় –

> ছোট্টবেলায় যখন মা আমাকে নাইয়ে দিতেন।
> তখন আপন খেয়ালেই বলে উঠতাম–
> আমাকে সাদী ভাইয়ের মতন ফর্সা করে দাও।
> নির্ভেজাল কর্তব্যনিষ্ঠ এক মোহনীয় আদর্শ
> যেন সৌম্যকান্তির প্রতিমূর্তি সাদী ভাই
> হারিয়ে গেলেন বিজয়ের দুই ঘণ্টা আগে।...

আজ থেকে প্রায় দু'যুগ পূর্বে রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক মুস্তাফা সারওয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ মুক্তিযোদ্ধা রূহুল ইসলাম সাদীর গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন বয়রাট মাজাইলে গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে ০৫-১১-১৯৯৯ তারিখের *দৈনিক জনকণ্ঠে* 'শহিদ সাদীর মা-বাবার স্বপ্ন কি পূরণ হবে? ' শিরোনামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন–

> শহিদ রূহুল ইসলাম সাদীর ছোট বোন মিলি, ওর ভাই একেএম মোফাখ্খারুল ইসলাম রান্নু ও মাজহারুল ইসলাম পলাশকে সাথে নিয়ে ওদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে শুনেছি, ইংরেজদের মতো ফর্সা, লম্বা দেহের সেই হাসিমাখা মানুষটি পেশোয়ার থেকে গোয়ালন্দ হয়ে পাংশা দিয়ে গ্রামের বাড়ী বয়রাট আসলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেক মানুষ ওর সাথে কথা বলতে বলতে মিছিল করে আসতো। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর একজন সৈনিক হিসেবে প্রতিটি মুহূর্ত দেশের চিন্তায় অস্থির থাকতো সাদী। সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসারসহ প্রায় প্রতিটি বাঙালি দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধকালে '৭১-এর ১৬ এপ্রিল পেশোয়ার থেকে গোয়েন্দাদের হাতে ধরা না পড়তে সাদী মুক্তিযুদ্ধে তার তাফু কাকাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দেশে মায়ের রোগমুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করতেই হবে। সম্ভব হলেই চলে আসবো।' চিঠিটা আজও পরিবারের কাছে সংরক্ষিত আছে।

অকুতোভয় বিমানসেনা রূহুল ইসলাম পেশোয়ার থেকে ০২-০৩-১৯৭১ তারিখে তাঁর বাবাকে লিখেছেন–

> আমি সব দিক দিয়ে ভালো আছি। দেশের এই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না বা হবে না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক মুস্তাফা সারওয়ার *দৈনিক জনকণ্ঠ-এ* প্রকাশিত তাঁর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেছেন–

> শহিদ রূহুল ইসলাম ছিলেন পাকিস্তান এয়ারফোর্সের এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার। পেশোয়ার পাক বিমানঘাঁটি থেকে পালিয়ে এসে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন ৮ নং সেক্টরের অধীনে। এই সেক্টরের অধিনায়ক কর্নেল (অব.) আবু ওসমান লিখেছেন : 'এই বীর মুক্তিযোদ্ধা আমার সেক্টরের গর্ব। এই তরুণ মুক্তিসেনা স্বাধীনতার জন্য যে- জীবন উৎসর্গ করেছেন তা অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর বৃদ্ধ মাতা-পিতার সাহায্যে হাত বাড়ানো আমাদের জাতীয় কর্তব্য।' তাঁর পিতা আফসোস করে বলেছেন, তাঁর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তান যদি আর মাত্র ২ ঘণ্টা বেঁচে থাকতো,

তাহলেই তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতা ও বিজয় দেখে যেতে পারতো। শহিদ হওয়ার আগে তিনি শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও ছিলেন। আত্মসমর্পণ করলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন। এর মাত্র দু'ঘণ্টা পরই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যায়। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ রুহুল ইসলাম সাদী পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপ্রধান জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মাত্র দু'ঘণ্টা পূর্বে শহিদ হন। যে বিজয়ের স্বপ্নে তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন সে বিজয় অর্জন আর দেখে যেতে পারেননি।

পিএএফ পেশোয়ার থেকে ০৯-০৩-১৯৭১ তারিখে রুহুল ইসলাম তাঁর স্নেহময়ী জননীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছেন–

আমার জন্য কোনো চিন্তাই করবা না। কারণ আমাদের ভিতরে কোনোদিনই গণ্ডগোল হতে পারে না। আমি সব দিক দিয়েই ভালো আছি। কোনো দিক দিয়েই অসুবিধা হয় নাই বা হবে না।... নিজের ও মণিদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখো। দেশের পরিস্থিতি বুঝে বাড়িতে আসছি। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি সব দিক দিয়েই ভালো আছি।

২০-০৫-১৯৭১ তারিখে পেশোয়ার থেকে বড়ো ভাই একেএম আমিরুল ইসলাম হাদীকে 'মিয়ে ভাই' সম্বোধনে লেখা পত্রে রুহুল ইসলাম নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন, পারিবারিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিষ্কলুষ-নির্মোহ দেশাত্মবোধ-

আমি জানি ও নিজেই প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি, আব্বা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন; এ ক্ষেত্রে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কিছুই নাই। আব্বাকে খুব বুঝায়ে ও সান্ত্বনা দিয়ে যেভাবেই হোক চিঠি দিবেন। আর আমার কথা ও চন্দনের কথাও লিখবেন যে, তারা সবদিক দিয়ে ভালো আছে। বর্তমানে বিশেষ কোনো কাজ-কর্ম করতে দেয় না। কারণ... ? তবে এখন শহরে ও সব জায়গায় বিনা বাধায় ঘোরাঘুরি করতে দিচ্ছে ও করছি। এছাড়া অন্য কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আমার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না।

হতাশাকে দূরে ঠেলে সবাইকে আশাবাদের কথা শুনিয়ে অকপটে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সদিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

দেশের জন্য ও নিজেদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য কোনো দুঃখ বা আফসোস করবেন না। যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল, সে তুলনায় আমাদেরটা কিছু না। আমরা জয়ী হবোই– সুনিশ্চিত। প্রাণঢালা শ্রদ্ধায় দেশবাসী যেন মনোবল রাখে অতীতের মতো।

এই বন্ধুবৎসল সৈনিক সহযোদ্ধাদের কুশলাদি জানাতে যেমন ভুল করেননি, তেমনি জানিয়েছেন স্বজনদের নানা প্রসঙ্গ–

এনাম কাকুর থেকে এ মাসের ৬-৫ তাং এসে ১২-৫ তাং পর্যন্ত ছিল। ওর আসায় মনটা ভালো লাগছিল; যাওয়ার সময় ওকেও ৫০.০০ টাকা দিয়েছি। ওর ট্রেনিং ভালো চলছে, স্বাস্থ্যও ভালো আছে। পেন্টু কাকার সঙ্গে দেখা হলে সবই বলবেন, ও আমার ছালাম বলবেন। আর আমার বন্ধু 'মাহবুব' যার ঠিকানা আগে দিয়েছিলাম, তার থেকে ঐ ১০০ টাকা পেয়েছেন কিনা লিখবেন।

একই পত্রের শেষাংশে রুহুল ইসলাম আবারও সবাইকে সাবধান করে দিয়ে লিখেছেন–

বাড়ির জন্য ও দেশের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না, আমাদের মতো সবারই একই অবস্থা। নিজের শরীর যেন ভালো থাকে ও অন্য ক্ষয়-ক্ষতি যেন না হয়, এজন্য সাবধানে চলাফেরা করবেন। আম্মাকেও বুঝায়ে ও সান্ত্বনা দিয়ে লিখবেন। বড় মামা ও অন্য সবার সংবাদ জানলে লিখবেন।

একমাস পর ২১-০৬-১৯৭১ তারিখে রুহুল ইসলাম স্বদেশে ফিরে আসবার সদিচ্ছা জানিয়ে তাঁর বাবার কাছে লিখেছেন–

দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের পথে যাচ্ছে। এর জন্য চিন্তা করবেন না, দুঃখের পর সুখ একদিন আসবেই। শুধু নিজেরা যাতে বেঁচে থাকতে পারেন, সেই চেষ্টা করবেন। আমার জন্য কেন চিন্তা করবেন ? আমি ও এদেশে যারা আছে, সবাই ফিরে আসবো। চেষ্টা করছি যতদূর সম্ভব হয় চলে আসবো। তবে আমাদের এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ঢাকা থেকে পথের ভিতর অসুবিধা হতে পারে বলে আসছি না। যাহোক পরিস্থিতি একটু ভালো হলেই চলে আসবো।

পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে রুহুল ইসলাম তাঁর দুই মামা ও নানির কথা এই চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন–

বড় মামাকে *Telegram* করেছি, উত্তর পাই নাই। জানি না, সবাই বেঁচে আছে কিনা। মাখন মামার দোকান লুট হয়ে গেছে, মিয়ে ভাই-এর চিঠিতে জানলাম। ও', সে নাকি ইন্ডিয়া চলে গেছে! বর্তমানে নানিদের অবস্থা কী হচ্ছে, খোঁজ নিয়ে নানিকে আমাদের এখানে নিয়ে আসবেন।

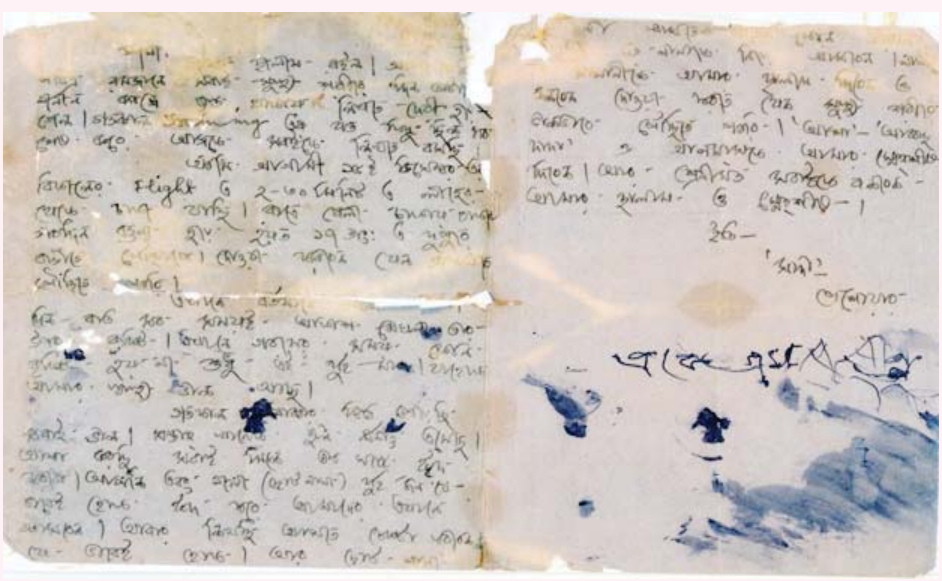

দুঃস্বপ্নের দুষ্ট প্রহর কাটিয়ে আপনজনদের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় ৩০-০৯-১৯৭১ তারিখে বাবাকে লেখা আরেকটি পত্র–

> এই চিঠি পাওয়ার আগে খুবই চিন্তার মধ্যে ছিলাম। চিঠি পেয়ে চিন্তা দূর হলো। মিয়ে ভাই লিখেছেন, ছুটি পাচ্ছি না বলে যেতে পারছি না। লিখেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে চেষ্টা করবেন। আমিও বাড়ি যাওয়ার জন্য বার বার লিখে দিয়েছি।

তবে ঘোর এক অমানিশার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন পত্রের পরবর্তী অংশে; রয়েছে সাবধানে চলাচলের অগ্রিম সতর্কবার্তা–

> বাড়িতে যে টাকার প্রয়োজন ও সব জিনিসের দাম অত্যধিক– সবই জানি। যাহোক এ পরিস্থিতিতে নিজেদের বাঁচানো ছাড়া উপায় নেই। কারণ বর্তমানে ধনী-গরীব সবই এক। খুব সাবধানে চলবেন। ভবিষ্যতে এর চেয়ে খারাপ সময় আসছে। আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। বেঁচে থাকলে দেখা নিশ্চয়ই হবে।

বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে থাকলেও এই তরুণ মুক্তিসেনা দেশের সব খবরই রাখেন; পত্রে রয়েছে তেমনি কিছু নির্দেশনা–

> বর্তমানে দেশেই জীবনের নিরাপত্তা নাই, কিন্তু এখানে সেটা আছে। দোয়া করি, যেন যেয়ে সবাইকে দেখতে পাই। আর বাড়ি ছাড়া কোথাও যাবেন না, নামায-কালাম বাড়িতেই পড়বেন। নানির সংবাদ নিয়ে যদি আমাদের এখানে আসে, তাহলে নিয়ে আসবেন। মামার খোঁজও নিয়ে সব জানাবেন।

তবে এক বছর পূর্বে (১৯৭০ সালের শেষ দিকে) মাখন মামা অর্থাৎ নিবন্ধকারের বাবা মুনশি আক্কাছ উদ্দিন আহমেদকে লেখা একটি পত্রে রুহুল ইসলাম তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা জানিয়েছেন–

> আমি আগামী ১৫ই ডিসেম্বর-এর বিকালের *flight*-এ ২:৩০ মিনিটে লাহোর থেকে ঢাকা যাচ্ছি। রাত্রিবেলা ঢাকায় থাকবো, পরদিন রওয়ানা হয়ে হয়তো ১৭ তারিখে দুপুরে বাড়িতে পৌঁছাবো। দোয়া করবেন যেন ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি। এখানে বর্তমানে ভীষণ শীত। দিন-রাত সব সময় আকাশ মেঘলা, তার উপর বৃষ্টি। এখানে গরমের সময় বৃষ্টি হয় না, শুধু এই দুই মাস। যাহোক আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে। আশা করছি সবাই মিলে একসঙ্গে ঈদ করবো। আপনি এবং ছোট নানা দুইজন যেভাবেই হোক ঈদ করে আমাদের এখানে আসবেন। আবার লিখছি, আসতে চেষ্টা করবেন যেভাবেই হোক। নানিকে ও মামানিকে আমার ছালাম দিবেন ও বলবেন দোয়া করতে যেন সুস্থ শরীরে ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি।

একই পত্রের শেষাংশে একটুখানি স্নেহের পরশ বুলিয়ে তাঁর মামাতো ভাইবোনদের কথা লিখতে ভোলেননি রুহুল ইসলাম–

> আশা, আব্বাছ দাদা ও আলমাসকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। আর শ্রেণিমতো সবাইকে বলবেন আমার ছালাম ও স্নেহাশীষ।

বিশিষ্ট কলাম লেখক মুস্তাফা সারওয়ার 'যদি ডাকো এপার হতে– এই আমি আর ফিরবো না' শিরোনামে *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এর 'স্মরণ' কলামে স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ রুহুল ইসলাম সম্পর্কে সাবলীল ভাষায় তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন–

> বাঙালি জাতির কাছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। বর্তমান প্রজন্ম '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্বিঘ্নে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের কথা জানতে পারলে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চান। মুক্তিযুদ্ধের বীরদের তথ্য কথা আমাদের জীবনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। একাত্তরের বীরত্বের গণসচেতনতা বাংলাদেশের সমৃদ্ধির জন্যে এক মহাসম্পদ। একাত্তরের এমনি একজন অজানা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ রুহুল ইসলাম সাদী যিনি '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মাত্র ২ ঘণ্টা আগে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। যিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পেশোয়ারে কাজে থাকা অবস্থায় পালিয়ে আসা এক সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। এই দেশে অবস্থানকারী স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি অবদান ছিল পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি সৈনিকদের। প্রতিটি মুহূর্ত ওদের বুকে বুলেট ধরে রাখার মতো অবস্থা ছিল।
>
> '৭১-এর জীবিত মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমান কর্মরত কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মেজর জেনারেল-এর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত গণসম্মুখযুদ্ধে নিহত শহিদ সাদীর জীবন উৎসর্গের অবদানের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অতি ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে করে শহিদ সাদীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গৌরববোধ করেন। বিদেশেও এই ধরনের জীবিত ব্রিগেডিয়ার জেনারেলরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জীবন দেয়া সৈনিকদের নাম শুনে টুপি খুলে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানান। '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ফলে বাঙালি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, সেনাপতি, শিল্পপতি, কোটিপতি, সচিব, রাষ্ট্রদূতসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে এদেশের অনেক নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তরা অতি উচ্চস্থান পেয়েছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার ফলে প্রতিষ্ঠিত ভাগ্যবান আমাদের অনেকেই স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গকরা শহিদদের কথা জেনে কি শ্রদ্ধাভরে সামান্যতম স্মরণ করি ?

কলাম লেখক মুস্তাফা সারওয়ার তাঁর আন্তরিকতার সবটুকু উজাড় করে দিয়ে এই নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদনে আরও লিখেছেন–

> সেই পাকিস্তান বিমান বাহিনী পেশোয়ার থেকে পালিয়ে এসে সম্মুখযুদ্ধে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধার কথা জেনেছিলাম যখন শহিদ সাদীর ছোট বোন মিলি একটা অফিসে কার্যরত অবস্থায় হঠাৎ তার এক ঘনিষ্ঠের টেলিফোনের জবাবে বলেছিলেন, স্বাধীনতার বিজয় দিবসে ওদের বাড়িতে কোনো আনন্দ থাকে না, দুঃখ আর কান্না-ভরা থাকে সেদিন। আমার মেয়ে নিপার বয়স থেকে ৪ বছরের ছোট মিলির এই কথা শুনে '৯৭-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের একটি অনুষ্ঠান শেষে মিলিদের বাসায় সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। মিলির বড় বোন লিলি, সাংবাদিক স্বামী আনসারীর ১১ বছরের মেয়ে প্রথমা ও ৭ বছরের ছেলে প্রান্তসহ আমার উপস্থিতিতে ওরা অবাক হয়েছিল। বিজয় দিবসের আনন্দের দিন মিলিদের বাসায় গিয়ে সেদিন দুঃখ-বেদনা আর অব্যক্ত কান্না দেখেছিলাম। প্রথমা-প্রান্ত মুখস্থের মতো বলছিল– ১৬ই ডিসেম্বর এতোটা সময়ে সাদী মামা যুদ্ধ করতে করতে গুলি লেগে মারা গিয়েছিলেন। শহিদ সাদীর কথা শুনলেই স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে আমার স্ত্রী খালেদা শিরি'র দু'ভাই শহিদ শেখ ওয়ালিউর রহমান পারু ও শেখ ওয়াহিদুর রহমান চারুকে '৭১-এর এপ্রিলে

যশোর ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করার কথা। ওদের মা শেখ লুৎফুন নেছাও হাসপাতালে ঘেরাও থাকাকালে শহিদ হয়েছিলেন।

শহিদ সাদীর কবরটি ১৯৯২ সালে বাঁধাই এবং শ্বেতপাথর লাগানোর পর প্রথমবারের মতো দেখামাত্র প্রিয় বোন মিলি ওর অতি শ্রদ্ধাস্পদ ভাইয়ের কথা মনে হতেই বুকফাটা চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। মিলি বলেছিল, সাদী ভাই বহুবার ওকে কোলে নিয়ে অনেক অনেক আদর করে ওর নাম মিলি রেখেছিল। মিলি বড় হয়ে বাবা-মা-ভাইদের কাছে তাকে এমএ পাশ করাবার সাদী ভাইয়ের বায়নার কথা শুনে পাকবিমান বাহিনীতে কর্মরত একমাত্র উপার্জনক্ষম ভাই-এর অভাবে পিতা ওহাব মিঞার রাইস মিল হাতছাড়া হওয়ায় সংসারের অভাব-অনটনের মাঝে নিজের জীবনকে সংগ্রামী করে কষ্ট করে সে এমএ পাশ করেছে।

মিলিদের গ্রামে গিয়ে শুনেছি– ইংরেজদের মতো ফর্সা, লম্বা দেহের সেই মানুষটি পেশোয়ার থেকে গোয়ালন্দ হয়ে পাংশা দিয়ে গ্রামের বাড়ি এসে প্রায় প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের অর্থে করাচি-ইসলামাবাদেরই কেবল উন্নয়ন হচ্ছে, সে কথা বলতেন। তাঁর ইচ্ছে করতো বাবা-মা, ভাই-বোনদের নিয়ে একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে ও খাওয়া-দাওয়া করতে। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর পাক-বিমান বাহিনীর একজন সৈনিক হিসেবে সাদী প্রতি মুহূর্তে দেশের চিন্তায় অস্থির থাকতেন। একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে পেশোয়ার থেকে অতি দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে ভারতে বহুপথ পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসে বাবা-মা-ভাইদের কাছে কিছুদিন গোপনে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিদায় নেয়ার সময় শুধু বলেছিলেন যে, তিনি আর কোনোদিন পেশোয়ার ফিরে যাবেন না। এদেশে থেকেই মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবেন। ঢাকায় একটা বাড়ি করবেন বলে হাসপাতালে চাকুরিরত বড় ভাইকে তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই দেশ স্বাধীন হবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। পালিয়ে আসা এই তরুণসেনা এক সময় পাকিস্তানি শত্রুদের হাতে ঘেরাও হওয়া অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে আত্মসমর্পণ না করে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে শত্রুনিধন করতে করতে দেশ স্বাধীন করার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেন। দেশের জন্য এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কথাগুলো বলেছেন শহিদ রূহুল ইসলাম সাদীর মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী রবিউল ইসলাম কুসুম; এখনও জীবন্ত সাক্ষী হয়ে সাদীর পেশোয়ার থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রসহ মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন।

নিবন্ধকারের পিতা (শহিদ রূহুল ইসলামের মামা) মুনশি আক্কাছ উদ্দিন আহমেদ তাঁর আদর্শের মূর্তপ্রতীক এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উৎসর্গ করে 'মাতৃমুক্তিপণ' শীর্ষক কবিতায় মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন–

ষোলই ডিসেম্বর একাত্তর সাল–
স্মরণীয় বরণীয় রহো চিরকাল।
ফরিদপুর জেলার সেই লক্ষ্মীকোল গ্রাম,
স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর রূহুল ইসলাম;
অজ্ঞাত, অখ্যাত এক মসজিদ প্রাঙ্গণ–
সেথায় রয়েছো আজ করিয়া শয়ন।
ভুলিতে পারিনে তোমায় এত বড় শোক,
'রোগমুক্ত করবো মাকে যে করেই হোক'–
লিখতে তুমি এই কথা প্রতি চিঠির মাঝে,
পাকিস্তান ছেড়ে তাই এলে দেশের কাজে।

অপারেশনে করিতে দূর মায়ের সে রোগ,
দিলে ওদের বুকে লাথি
মেরে মুক্তিফৌজে যোগ।
কুমারখালি-খোকশা-মাছপাড়া দখল–
রাজবাড়ী দখলে আর হলে না সফল,
বাংকারে রেখে তোমায় সঙ্গী-সাথিগণ ;
আপন-আপন জান বাঁচাতে করলো পলায়ন।
শহিদ হলে তুমি বিজয়ের শুভক্ষণে,
আজ বড় ব্যথা বাজে তাই সকলের প্রাণে।
দেখে যেতে পারোনি বাবা এই দেশের বিজয়,
দোআ' করি তোমায় যেন বেহেশ্‌ত নসিব হয়।

মুস্তাফা সারওয়ার আরও লিখেছেন– বহু কষ্ট করে সাদীর কথা জানার পর মিলি, ওর ভাই মাজহারুল ইসলাম পলাশ, পলাশের স্ত্রী লাভলী এবং বড়ো ভাই মোফাখ্‌খারুল ইসলাম রান্নুকে নিয়ে আমরা রাজবাড়ী শহরের পাশে গিয়ে এই শহিদ বীর সৈনিকের সমাধি লিপিতে কথাগুলো উৎকীর্ণ দেখেছিলাম–

হে নবপ্রজন্ম,
দাঁড়াও কিছুক্ষণ এই সমাধিস্থলে–
অবনত শিরে, পরম শ্রদ্ধাভরে,
করহ স্মরণ অশ্রুসজলে;
এখানে চিরনিদ্রার কোলে শয়ান,
রাজবাড়ীর তিন সূর্যসন্তান...।

সমাধিতে শহিদ রূহুল ইসলাম সাদীর সঙ্গে নিহত অপর দুই সহযোদ্ধা শহিদ শফিক ও শহিদ রফিকের নামও যুক্ত রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এই শহিদের গ্রামের বাড়ি বয়রাটে পাঠাগার, স্মৃতিসংঘ গড়ে উঠেছে তাঁর নামে। শহিদের ভাইয়েরা প্রতিবছর 'শহিদ রূহুল ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করে থাকেন; ১৬ই ডিসেম্বর শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও কাঙালিভোজের আয়োজন করেন তাঁরা। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত 'সোনার বাংলা সোনার মানুষ' নামের কবিতা সংকলনের ৭১টি কবিতার মধ্যে রয়েছে মুজিবাদর্শের এই সূর্য সৈনিক বাংলার গর্বিত বিমানসেনা শহিদ মুক্তিযোদ্ধা রূহুল ইসলাম সাদীকে নিয়ে নিবন্ধকারের লেখা কবিতা 'মুজিবের বাংলায়, স্মৃতিসুধা উছলায়'। 'ভিন্নমাত্রায় বিজয়ের জয়ধ্বনি' নামে জেলা প্রশাসন ঝিনাইদহ থেকে বিজয় দিবস ২০১২-এর সংকলন *মুক্ত স্বদেশ*-এ এটি ছাপা হয়।

একটি বিষয়ের অবতারণা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সন্ধিক্ষণে নিবন্ধকারের পিতা ভাষা সংগ্রামী মুনশি আক্কাছ উদ্দিন আহমেদ স্টেশনারি দ্রব্যাদি ও পত্রপত্রিকার ব্যবসায়ের পাশাপাশি ঝিনাইদহ জেলার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ বেণীপুর হাইস্কুলে (স্থাপিত : ১৯০৬) বাংলার শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নির দুই পুত্র একেএম আমিরুল ইসলাম হাদী ও দ্বিতীয় পুত্র একেএম রূহুল ইসলাম সাদী তাঁদের মাতুলালয় (ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার কাঁচেরকোল) থেকে বেণীপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ব্রিটিশ আমল থেকে বৃহত্তর যশোর-কুষ্টিয়া-ফরিদপুরের এই সন্নিহিত অঞ্চলটি শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির পাদপীঠ রূপে সর্বমহলে পরিগণিত।

তাই এতদঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় শিক্ষায়তনের মধ্যে বেণীপুর হাইস্কুল হয়ে ওঠে সেরা মানুষ গড়ার কারখানা বা জ্ঞানচর্চার সূতিকাগার। সঙ্গত কারণে প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকগণ তাদের সন্তানতুল্য ছাত্রদেরকে পাঠ্যক্রমভুক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি, স্বাধিকার-স্বাধীনতা এবং নির্মোহ দেশাত্মবোধ ও মানবিক মূল্যবোধের ওপরে নিয়মিত প্রেষণা দিয়ে থাকেন। তারই ইতিবাচক ফল স্বরূপ বেণীপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একটি বৃহদংশের মধ্যে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধসহ ভাষাশিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, তথ্যপ্রযুক্তি, সেবামূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে অনন্য নজির স্থাপন করে চলেছে।

আলোচ্য 'মুজিবের বাংলায়, স্মৃতিসুধা উছলায়' কবিতায় স্মৃতি থেকে একাত্তরের সেদিনের চিত্রমালা উপস্থাপনের প্রয়াস–

> একটা প্লেন দেখলেই ভাবতাম– সাদী ভাই যাচ্ছে বোধ হয়,
> পাকিস্তান এয়ারফোর্সে ছিলেন আমার সেই ফুফাতো ভাই–
> বেণীপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, বাংলার সূর্যসন্তান;
> কালে-ভদ্রে দেশে এলে তাঁর আনতে একটুও ভুল হতো না
> দারুণ মোড়কে শুকনো খেজুর আর ঘিয়ে-ভাজা লাচ্ছা সেমাই,
> দরজার খিড়কি ত্রঁটে দিয়ে চুপিসারে কত যে খেয়েছি আমি!
> আজো যেন সে অমৃতের স্বাদ মুখে লেগে আছে।...

একাত্তরের রক্তিম পতাকায় আজও আমি সাদী ভাইয়ের সে গৌরবদীপ্ত ছবি দেখতে পাই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে–

> জনকের আহ্বানে স্থলপথে ভাই আমার এলেন দেশে–
> ধব্ধবে সাদা এ বিমানসেনার শুরু হয় সংগ্রামী জীবন,
> খোকশা-পাংশা-কুমারখালি আর মাছপাড়ার যুদ্ধ শেষে,
> রাজবাড়ীর সম্মুখ-সমরে সাথীরা পালায় তাঁকে ফেলে;
> গুলিবিদ্ধের আর্তচিৎকারে গুলির বাক্সটি দেয়নি এগিয়ে।
> দু'হাতে শত্রুনিধন শেষে লুটিয়ে পড়েন ধূলির ধরায়
> স্মৃতি অম্লান এই বঙ্গবিজয়ের মাত্র দু'ঘণ্টা আগে
> উপহার দিয়ে রক্তিম পতাকা আর স্বাধীন স্বদেশ।

ইতোমধ্যে এই অকুতোভয় শহিদ মুক্তিযোদ্ধার মা-বাবা অনেকটা আর্থিক টানাপড়েনের ভেতর দিয়েই ইহলীলা সাঙ্গ করেছেন। তাই এই নির্ভীকযোদ্ধার জন্যে যেন বিলম্বে হলেও একটি রাষ্ট্রীয় খেতাব বা সম্মাননার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁর নামে সড়ক-সেতু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা অপরাপর স্থাপনা গড়ে ওঠে– এমনই আকুতি প্রকাশ করেছেন তাঁর ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, এলাকাবাসীসহ অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী। বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠনের রাষ্ট্রীয় অভিষেকে তারা অনেকটাই আশাবাদী। অবশ্য ঢাকায় একটা বাড়ি করবেন বলে হাসপাতালে কর্মরত বড়ো ভাই আমিরুল ইসলাম হাদীকে রূহুল ইসলাম তাঁর প্রত্যাশার কথা জানিয়েছিলেন– 'অবশ্যই দেশ স্বাধীন হবে। আর সে স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় একটা বাড়ি করবার একমাত্র শখ।' ভাইবোনদের ঢাকায় নিয়ে তিনি মানুষ করবেন। কিন্তু পেশোয়ার থেকে বহু কষ্ট করে পালিয়ে এসে সাদীর মতো যাঁরা স্বাধীনতার সম্মুখযুদ্ধ করতে করতে জীবন দিয়ে গেলেন, সেই শহিদ সন্তানের ঢাকায় বাড়ি করার স্বপ্ন অনুযায়ী জীবিত পিতামাতাদের ঢাকায় মাথা গোজার জন্য একখণ্ড জমির আবেদন বিবেচিত হতে পারে বলে শহিদ পিতামাতার অনেক প্রত্যাশা ছিল। মুজিবাদর্শের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সূর্য সৈনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ একেএম রূহুল ইসলাম সাদীকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র ও জীবনীগ্রন্থ হতে পারে; তাতে তরুণ প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বিলম্বে হলেও যেন তাঁর একাত্তরের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়– প্রধানমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ নানা সংগঠন-প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই আকুল আহ্বান উত্তরসূরিদের। কবিতার শেষাংশে রয়েছে প্রত্যাশাপ্রাপ্তির মিশেলে গড়া হর্ষ-বিষাদের চিরায়ত শাশ্বত রূপ–

> মুজিবের এ বাংলায়, শুধু স্মৃতিসুধা উছলায়!
> শত প্রাপ্তির মাঝেও অপ্রাপ্তির অব্যক্ত বেদনায়
> এক চোখে হর্ষ আরেক চোখে বিষাদের ছাপ;
> তাই বিজয়ের ধ্বনিতে আনে এক ভিন্নমাত্রা।

তথ্যনির্দেশ

১. *একাত্তরের একগুচ্ছ চিঠি*, সংগ্রাহক, মুনশি আক্কাছ উদ্দিন আহমেদ, মাধ্যম– একেএম মোফাখ্খারুল ইসলাম

২. 'বিজয়ের আস্বাদ', আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, *আদ্যাক্ষরিকা ও কল্যাণীয়েষু*, অপ্রকাশিত কবিতা সংকলন

৩. 'মাতৃমুক্তিপণ', মুনশি আক্কাছ উদ্দিন আহমেদ, *সঞ্চয়নী*, সৃজনী, ঝিনাইদহ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩; পৃ. ৪৮-৪৯

৪. 'মুজিবের বাংলায়, স্মৃতিসুধা উছলায়', আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, *সোনার বাংলা সোনার মানুষ*, বেগবতী, ২০২০

৫. 'ভিন্নমাত্রায় বিজয়ের জয়ধ্বনি', আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, *মুক্ত স্বদেশ*, ডিসেম্বর ২০১২, জেলা প্রশাসন, ঝিনাইদহ

৬. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একেএম রূহুল ইসলাম সাদীর *সমাধিলিপি*, রাজবাড়ী, মাধ্যম– একেএম মোফাখ্খারুল ইসলাম

৭. মামাকে লেখা শহিদ রূহুল ইসলাম সাদীর চিঠি, পারিবারিক সংগ্রহ, সংগ্রাহক– মুনশি আক্কাছ উদ্দিন আহমেদ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ০৫-১১-১৯৯৯; [শহিদ সাদীর মা-বাবার স্বপ্ন কি পূরণ হবে ?]

২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, *ডিসেম্বর*, ২০০১; [যদি ডাকো এপার হতে– এই আমি আর ফিরবো না]

৩. *সাপ্তাহিক সেরাখবর*, খুলনা; ১৫-১২-২০০৯ [শহিদ সাদী ও তাঁর একাত্তরের চিঠি]

৪. *মনন*, ১ম সংখ্যা, ২০১১; ঝিনাইদহ জেলা সাহিত্য পরিষদ [শহিদ সাদী ও তাঁর একাত্তরের চিঠি]

৫. *দুরন্ত প্রকাশ*, ২৬-১১-২০১৭ [শহিদ সাদী ও তাঁর একগুচ্ছ একাত্তরের চিঠি]

৬. *ধ্বনি*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯; [স্বাধীনতা সংগ্রামী রূহুল ইসলাম]

৭. বৈশাখী, টাঙ্গাইল; ডিসেম্বর ২০১৯ [মুজিবাদর্শের এক সূর্যসৈনিক ও একগুচ্ছ একাত্তরের চিঠি]।

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ: লেখক, গবেষক, সংস্কৃতিসংগঠক, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক: বাংলা বিভাগ, শিশুকুঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঝিনাইদহ

বীরাঙ্গনা মালতীবালা

সৈয়দা নাজমুন নাহার

আমার এই গল্পটি বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা। বীরাঙ্গনা মালতীবালার খোঁজে যাই পেশাগত কারণে। হাটের শেষ মাথায় নদীর ঘাট, অযাচিতভাবে বেড়ে উঠেছে বটবৃক্ষ। তারই ছায়ায় বসে আছে পাগলি-বোষ্টমি। যখন গান গায় তখন চোখ বুঝে মগ্ন থাকে। তখন মনে হয় ভিন্ন জগতের মানুষ, সেই গান শুনতে ভিড় লেগে যায়। গান শেষে চোখ খুলে দেখে তার সামনে বাতাসা, মুড়ি-কলা, চাল-ডাল, টাকাপয়সা– বোষ্টমি ফিরেও তাকায় না। হাটেই তার মতো ভেসে এসেছিল জগা। পুরো নাম জগদীশ আর কিছু জানে না। বয়স দশ। সে অভিভাবক হয়ে যায়, বোষ্টমির সেই জিনিসপত্র তুলে গুছিয়ে রাখে। হাটুরেরা চলে যায়। বোষ্টমি নির্জন ঘাটে একা বসে ভাবে কোথায় ছিল, কোথায় এল? মেলায় মেলায় আখড়ায় সে ঘুরে বেড়ায়। জগৎসংসারে তার কেউ নেই, তবে কেউ একজন আছে তার অন্বেষণে বেরিয়েছে।

কার্তিকের বেলা তাড়াতাড়ি পরে যায়। নদীতে জলে স্নান করে। তারপর উঠে আসে বটগাছের আড়ালে কাপড় ছাড়ে। ভিজে কাপড় মেলে দেয়, রোদ নেই, কিন্তু বাতাসে শুকিয়ে যাবে। রমিজ ঘরামি বাঁশ আর খড় এনে ঘর তুলে দেয়। খড়ের চালা আর চাটাইয়ের বেড়া। কুন্তি গোবর কুড়ায়। ফেলে দেওয়া সবজি কুড়ায়। কুন্তি ঘরখানা লেপে পুছে দেয়। ছোটো দাওয়ায় বসে তখন বোষ্টমি গান করে, সে তখন ভিন্ন জগতের মানুষ হয়ে যায়। হাটুরেরা ভালোবেসে সব দিয়ে যায়। তারও একটা কারণ আছে, একদিন একজনকে সাপে কাটে। সবাই তাকে বোষ্টমির কাছে আনে। সে যত ব্যথা পায়, তত চেপে ধরে। পায়ে গামছা দিয়ে বাঁধা ক্ষতটা দেখায়। বোষ্টমি তেলের শিশি ভেঙে সেই কাঁচ দিয়ে চিড়ে বিষাক্ত রক্ত বের করে গামছা দিয়ে বেঁধে দেয়। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দেয়। সুস্থবোধ করলে বাড়ি যায়। সেই থেকে বোষ্টমির ওপর সবাই নির্ভরশীল হয়ে যায়। একেকজন একেক বিশ্বাস নিয়ে আসে কিন্তু সে তো কবিরাজ নয়। হাতের কাছে যা পায় তাই দেয়। গাছপালারতো একটা গুণ আছে। বাকিটা ওদের বিশ্বাস। হাট আসে হাট যায়। মন চাইলে বোষ্টমি গান করে। ইচ্ছে না করলে

গান করে না। সে পরম ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়েছে।

কুন্তি, জগা, তার সুখ-দুঃখের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। কুন্তির বুড়ো বাপ-মা ছাড়া কেউ নেই। যদি ভালো থাকে কাজ করে, হাঁপানির টান বাড়লে করে না। বোষ্টমি চিড়া-কলা-দুধ খায়, জগাও তাই খায়। খাওয়া শেষে বলে জগা কত টাকা আছে তোর কাছে? জগা বলে তিরিশ টাকা, ঠিক আছে কাল হাটবার গরুর ব্যাপারীকে ডেকে আনবি। জপতপ করে খেজুর পাতার চাটাই পেতে শুয়ে যায়। হাটবার বোষ্টমি শেষ রাতে স্নান সেরে নেয়। চুলায় গনগনে আগুনে সেদ্ধ ভাত হচ্ছে, আলু, পেঁপে, কাঁচকলা, চাল এক সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে নুন-কাঁচালঙ্কা মেখে। তাই খেয়ে নেয়। বেলা বাড়লে জগা গরুর ব্যবসায়ীকে নিয়ে আসে।

মা ডেকেছ। তা ডেকেছি। একটা গাই-বাছুর দাম কত হবে? তা আর কত? তিন কুড়ি। ঠিক আছে। জগার কাছে এক কুড়ি দশ টাকা আছে আর তোমার বাকি টাকা হাটে নিও। ঠিক আছে মা। আমি জগার কাছে এখন দিয়ে দিচ্ছি। কুন্তি গাই পেয়ে মহাখুশি। জগাকে বাজারের কোনো দোকানে লাগিয়ে দিবে ভাবে। দিন গড়িয়ে মাস আসে আর মাস গড়িয়ে বছর আসে। জগা আশপাশের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনে, কচুঘেঁচু, শাকপাতা, এসবও আজকাল বেচা-বিক্রি হয়। জগা আরেকটা কাজ ভালো পারে, মৌচাক ভাঙতে পারে। জঙ্গলে হলে কথাই নেই পুরোটাই তার। আর গ্রামে কারও গাছে হলে অর্ধেক দিয়ে আসতে হয়। বোষ্টমির জীবন একইরকম একবেলা আহার অন্যবেলা ফলাহার। কিন্তু মানুষের ভালোবাসা এই বটগাছের শেকড়ের মতো। বীরগাঁও গ্রামের মানুষের ভালোবাসা, মাটির টান দুটোই তাকে টানে। আবছা আবছা মনে পড়ে তার একটা অতীত আছে। কী তা মনে করতে পারে না। কিন্তু এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারে না। জগার সঙ্গে গ্রামে বের হয়। মন্দিরের টুং টাং আওয়াজ আর বোষ্টমি গলা খুলে গাইছে, 'না পোড়াইয়ো রাধার অঙ্গ না ভাসাইয়ো জলে, মরিলে ঝুলাইয়ে রেখ তমালেরও ডালে'।

গ্রামের শেষ মাথায় এসে যায়। জগা বলে মা ঠাকুরুণ ঐদিকে কিছু নেই, পালপাড়া ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিরা পোড়ায় মারছে, আর যারা ছিল তারা ভারতে চলে যায়। তাইতো ভাবে বোষ্টমি কেন এখান থেকে সরে যেতে পারছে না। কেমন অস্থির অস্থির লাগে। খালি ভ্যান যাচ্ছে, তাতেই উঠে যায়। ফিরে চোখে-মুখে ঠান্ডা জল দেয়। জল খেয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে থাকে। বৃদ্ধ করিম শেখ রোজ একবার আসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। কন্যার মতো স্নেহ করে আজও আসে। বোষ্টমি উঠে বসে। এ কথা সে কথার পর সকালের কথা বলে। করিম শেখ বলে, না গিয়ে ভালোই করেছ। পালপাড়া শ্মশান হয়ে গেল চোখের সামনে। কেমনে ঐ মুক্তিযুদ্ধের সময় দুলু মাতব্বর রাজাকার হলো, তার বাহিনী আর মিলিটারি মিলে ছারখার করে দিল। লুটপাট, ঘরে আগুন, মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার– যারে যেভাবে পেল তারেই মারল, জঙ্গলে যারা পালাতে পারল তারাই বাঁচল।

দুলু মাতব্বর কই? ঢাকায় থাকে। চেয়ারম্যান ইলেকশন করবে, আসবে। মসজিদ-মাদ্রাসায় যতই দান করুক পাপের টাকায়, আল্লায় মাফ করবে না। যাই মা। ঠিক আছে। এই পালপাড়ার সতীশ পালের মেয়ে মালতী। বয়স তেরো। হায়েনারা তারেও রেহাই দেয়নি। মৃত ভেবে রাস্তায় ফেলে যায়। সন্ন্যাসী দলও পালাচ্ছিল নবদ্বীপের দিকে মালতীকে তুলে নেয়। নবদ্বীপে আশ্রমে তুলে চিকিৎসা করে কিন্তু স্মৃতি ফিরে আসে না। মালতীর গানের গলা ভালো, তাই নামকীর্তন করে। গানের দলের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে বহু পরিক্রমা করে। একদিন অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। কাঁধে ঝোলা, দু-খানা জামাকাপড়, জপের মালা, মন্দিরা বাজাতে বাজাতে চলে। স্রোতের শ্যাওলার মতো বীরগাঁয়ের ঘাটে তার জীবনতরী ভিড়ে। তার নিজের গাঁয়ে আশ্রয় হয়।

আমি যখন বীরগাঁয়ে যাই তখন বোষ্টমিকে নারী পুলিশ ঘিরে রাখে। সে নির্বিকারভাবে বসে আছে। ঘটনার সার সংক্ষেপ জানা যায়, বোষ্টমি একটা ঝকঝকে দা সংগ্রহ করে, রোজ নিরিবিলি হলে ধার করত। রোজ গানের আসর বসাত আর বেশি দিন থাকবে না তার জন্মভূমির মাটিতে। এদিকে ইলেকশনের জন্য দুলু মাতব্বর গ্রামে আসে, সঙ্গে পাহারা আছে। কিন্তু বোষ্টমির আখড়ায় আজ আসবে গান শুনতে। গান শোনা উদ্দেশ্য না, চায় নিজের প্রচার-প্রচারণা চালাতে। হাটে সভা হলো, গাঁয়ের দরদে সে কেঁদে ভাসালো। তারপর চা-মিষ্টি খেয়ে গান শুনতে এল। আলো-আঁধারি গান হচ্ছে। বোষ্টমি আগুনের চারপাশে নেচে নেচে গাইছে। আহা কী মিঠা গলা! হঠাৎ কোমর থেকে দা বের করে দুলু মাতব্বরের মাথায় কয়েকটা কোপ দিল, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। বোষ্টমি দাও ফেলে দিল। আর তার হাতের দাও পড়ে রইল। বীভৎস দুলু মাতব্বরের দেহ হোগলা দিয়ে ঢেকে দিল।

ভোরে ভোরে পুলিশ এল। বোষ্টমি নির্বিকার। পুলিশ বলে তুমি খুন করেছ? বোষ্টমি বলে– হ্যাঁ করেছি। আমি সতীশ পালের মেয়ে মালতীবালা। আমার তেরো বছর বয়সে ১৯৭১-এ আমার বাবা-মা-ভাইবোন– সবাইরে খুন করছে এই জানোয়ারের দল। আমারে রাতভর অত্যাচার করে রাস্তায় ফেলে যায়। সন্ন্যাসীর দল কুড়িয়ে নেয়। মাথায় গণ্ডগোল হয় কদিন পর সব ভুলে যাই। আশ্রম থেকে পালাই, ভাসতে ভাসতে নিজের গ্রামে আসি। অনেক দিন পর শৈশব দেখি, পালপাড়া সব স্মৃতি ভেসে ওঠে। প্রতিশোধের এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে। আমিও ছাড়িনি।

মালতীবালার কী হবে তা আইন দেখবে, কিন্তু এই বীরাঙ্গনা নারীকে স্যালুট করলাম।

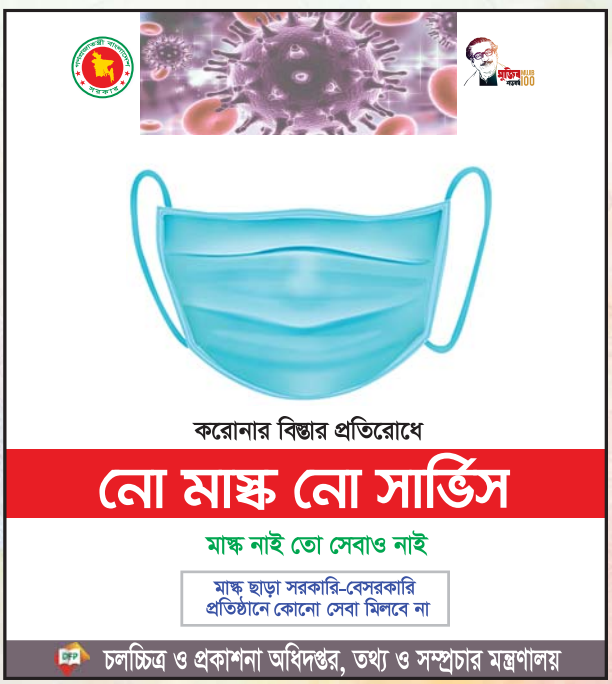

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বেগম রোকেয়া দিবস ও বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য

বশিরুজ্জামান বশির

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। বাংলাদেশেরই একটি গ্রাম পায়রাবন্দ, থানা মিঠাপুকুর, জেলা রংপুর। এ গ্রামেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবার হলো সাবের পরিবার। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে এই সাবের পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার বাবা আবু আলী সাবের। আরবি ও ফারসি ভাষায় রোকেয়ার পিতার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। বেগম রোকেয়ার মাতার নাম রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরাণী। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই বেগম রোকেয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, কোরানশরিফ পড়তেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজও পড়তেন। বিহারের ভাগলপুরে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিয়ের পর তাঁর জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল। বিয়ের পর বেগম রোকেয়া স্বামীর সঙ্গে ভাগলপুরে চলে যান। উদারমনা উচ্চশিক্ষিত স্বামীর উৎসাহ ও সাহায্যে বেগম রোকেয়ার কর্মপ্রেরণা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং সাহিত্যচর্চা শুরু হয়।

রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত রচনা বেরোয় *নবনূর* পত্রিকায় মাঘ ১৩১০ সালে। রচনার নাম 'নিরীহ-বাঙ্গালী'। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা হলেও প্রথম রচনা নয়। এর আগে অনেক লেখা লিখে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। তবে লেখিকা হিসেবে বিয়ের পরেই রোকেয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ। *নবনূর* ছাড়া অন্যান্য সাময়িক পত্রেও বেগম রোকেয়ার কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি মিসেস আর. এস. হোসেন নামে লিখতেন। *নবনূর* পত্রিকাটি চার বছর নয় মাস চলেছিল। এই সময়ে বেগম রোকেয়া হয়ে ওঠেন এই পত্রিকার প্রধান লেখিকা। তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নানারকম রচনা এতে প্রকাশিত হতে থাকে এবং সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। পারিবারিক জীবনে রোকেয়া এবং সাখাওয়াত উভয়েই ছিলেন মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী। স্ত্রীর শিক্ষার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। স্ত্রীর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এবং তার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করাও যে তার অবশ্য কর্তব্য এটাও তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রথম শুরু করেন ভাগলপুরে ১৯০৯ সালের পয়লা অক্টোবর। তারপর পারিবারিক কারণে বেগম রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে নতুন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। আটজন ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয়েছিল কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের যাত্রা। বেগম রোকেয়ার সংগ্রামময় জীবনের শুরুতেই আল্লাহ তাঁকে বিপদের মধ্যে ফেলে যেন বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে লাগলেন। স্কুলের দশ হাজার টাকা যে ব্যাংকে জমা রাখা ছিল, সে ব্যাংক ফেল হলো। এতে তাঁর যে দুচার জন শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী ছিল তারা নিরাশায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু বেগম রোকেয়া ভেঙে পড়লেন না। নিজের টাকা থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা স্কুলের জন্য দান করেন। স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বেগম রোকেয়া কলকাতায় ইংরেজি, বাঙালি, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সমাজের সকল অভিজ্ঞ কর্মদক্ষ নারীদের সঙ্গে মিশে কলকাতার বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর কার্যপ্রণালির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে নেন। তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ ছিল মুসলমান মেয়েদের অজ্ঞতার আঁধার

থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসা। বেগম রোকেয়া স্কুলের ছাত্রীদের কন্যাস্নেহে দেখতেন। মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর অসীম প্রচেষ্টায় ও অনুপ্রেরণায় অবশেষে ১৯৩০ সালে সাখাওয়াত স্কুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বেগম রোকেয়া নিজের সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তাঁর স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ কলকাতার একটি নামকরা মেয়েদের সরকারি স্কুল– সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

কেবল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বেগম রোকেয়া ছিলেন অগ্রদূত। শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশের পর বেগম রোকেয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা থেকেই তিনি অনুভব করেন নারী জাগরণ ব্যতীত নারীদের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। তাই নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি। তখনকার দিনে মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছেড়ে সভা-সমিতিতে যোগদান করবে– এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু বেগম রোকেয়া দিনের পর দিন চেষ্টা করে, ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন। হাত ধরে ধরে এক-একজনকে ঘরের বাইরে এনেছেন।

ও (৫) *অবরোধবাসিনী*, প্রকাশকাল ১৯২৮ সাল। মূলত প্রবন্ধ রচনা করলেও বেগম রোকেয়া কবিতা, উপন্যাস, গল্প, রম্য রচনা আর কিছু অনুবাদধর্মী লেখা লিখেছেন। আর সব রচনাই তাঁর ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। লেখিকা হিসেবে তিনি ছিলেন সমাজচিন্তিত ও সমাজোৎসারিত। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু– এই তিনটি ভাষাজ্ঞানকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। বাংলায় তো লিখতেনই, ইংরেজিতে লিখেছেন– *Sultana's Dream*। এর ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন– *সুলতানার স্বপ্ন*।

বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী– এই তিন রূপে বেগম রোকেয়ার বিকাশ। যে নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর স্বাক্ষর একদিকে তাঁর স্কুল, অন্যদিকে তাঁর চিন্তাশীলতা, যার প্রকাশ তাঁর রচনাবলিতে বিধৃত। বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর চলে গেলেন পরপারের ডাকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৩ বছর। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে স্মরণ করে প্রতিবছর বাংলাদেশ পালন করে বেগম রোকেয়া দিবস।

বেগম রোকেয়া বিদ্যমান কুসংস্কার, রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনাকে প্রতিহত করেছেন তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক ও গভীর ধর্মানুরাগের

স্বল্পশিক্ষিতা বেগম রোকেয়া নিজ অধ্যবসায় ও প্রতিভাগুণে সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রেও পরম গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার কাল তিন দশক ১৯০৩-১৯৩২। তেইশ বছর বয়সে প্রথম আত্মপ্রকাশ ('নিরীহ-বাঙ্গালী', *নবনূর*, মাঘ ১৩১০) থেকে মৃত্যুর আগের রাত্রি পর্যন্ত ('নারীর অধিকার', *মাহেনও*, মাঘ ১৩৬৪)। স্বামীর অকালমৃত্যু, স্কুল পরিচালনা ও স্কুলের কাজে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সাহিত্যচর্চা ছাড়েননি। প্রকাশে বিরতি ছিল কিন্তু সৃষ্টিতে বা রচনায় বিরতি ছিল না। বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশাতেই তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়– (১) *মতিচূর* (প্রথম খণ্ড), প্রকাশকাল ১৯০৫ সাল; (২) *Sultana's Dream*, প্রকাশকাল ১৯০৮ সাল; (৩) *মতিচূর* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশকাল ১৯২১ সাল; (৪) *পদ্মরাগ*, প্রকাশকাল ১৯২৪ সাল

আলোকে। তাঁর লেখনীতে ছিল যুক্তিনিষ্ঠতা ও আপোশহীন দৃঢ়ব্যক্তিত্ব। নারীর এগিয়ে চলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার পক্ষে তিনি যুক্তি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা ও কাজে। সমাজে নারীর অসম অবস্থানের কথা সবসময়ে ফুটে উঠেছে তাঁর দৃপ্ত কলমে। একটা রক্ষণশীল পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠার পরেও তিনি নিজের দৃঢ়প্রচেষ্টায় সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে উপেক্ষা করে এগোতে পেরেছিলেন। নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে বেগম রোকেয়া আজও আমাদের আলোকবর্তিকা।

বশিরুজ্জামান বশির: সাহিত্যিক, সমালোচক ও সাংবাদিক, poetbashir1974@gmail.com

ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ৯ই ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয় –পিআইডি

দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার বাংলাদেশ

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

'দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব'– প্রতিপাদ্য নিয়ে ৯ই ডিসেম্বর ২০২২ পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস'। বাংলাদেশও দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের ন্যায় চ্যালেঞ্জিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের শুরুতেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসনের অনুশাসন দিয়েছেন। জাতিসংঘ ২০০৩ সালে ৯ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ঘোষণা করে। সে হিসাবে এবার ২০তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস। ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন এগেইনেস্ট করাপশনের (আনকাক) মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে জাতিসংঘ। বাংলাদেশ ২০০৭ সাল থেকে সংস্থাটির সদস্য। বাংলাদেশ আনকাকের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন শুরু করে। সরকারিভাবে ২০১৭ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসটি উপলক্ষে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের বার্তা দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ সকলকে দুর্নীতি না করার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস বরাবরের মতো এবারও ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলায় বড়ো পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। একইসঙ্গে সকল সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি-আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সারা দেশে দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রদর্শনী, মানববন্ধন, সেমিনার ও আলোচনাসভা। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ও সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক সংগঠন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সাধারণ জনগণ এতে অংশগ্রহণ করে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন আবদুল্লাহ দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে তাদের বয়কটের আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এ আহ্বান জানান। দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা জানেন দুর্নীতিবাজ কারা, তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস দুর্নীতিবিরোধী এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করে। এর মূলে যে ধারণাটি রয়েছে– অপরাধ মোকাবিলা করা প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্ব। শুধু সহযোগিতা এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই অপরাধের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ২০তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। তাঁর ধারণ করা ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়। এ সময় দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা, দুর্নীতি করলে শাস্তি নিশ্চিত করার প্রতিও জোর দেন তিনি।

দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে আমি কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের অনুরোধ করব দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে তারা যেন সর্বোচ্চ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার বেলায় একই পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্ষমতা দেওয়া হয় দায়িত্ব পালনের জন্য, দেখানোর জন্য নয়। তাই দুদকের সকল কর্মচারীকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির

পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দুর্নীতিবাজ, কালোবাজারি ও লুটেরাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে সপরিবার হত্যাকাণ্ডের পর উন্নয়নের সেই গতি থমকে দাঁড়ায়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে সংবিধানে যে নির্দেশনা আছে সে কথাও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ২০-এর ২ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'রাষ্ট্রের এমন অবস্থার সৃষ্টির চেষ্টা করলে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না।'– এই মর্মবাণীকে ধারণ করে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দুর্নীতিকে শুধু বাংলাদেশের নয়, দুর্নীতিকে বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দুর্নীতি এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা। আমি মনে করি, মানুষের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চেতনা তৈরি ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই বলেও মনে করেন রাষ্ট্রপতি। ঘুষখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করার আহ্বান জানান তিনি।

দুদকের কাজের প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ক্ষমতার অপপ্রয়োগকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। দুর্নীতি করলে শাস্তি পেতে হয়– সমাজে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আশার কথা হলো, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম যুগপৎ পরিচালনা করছে।

দুদকের হটলাইন নম্বর ১০৬-এর প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দুদকের হটলাইন সেবাও একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধকে আরও বেগবান করতে কমিশনকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সভাপতিতে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার জহুরুল হক, ড. মোজাম্মেল হক খান ও সংস্থাটির সচিব মো. মাহবুব হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেন, অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। এসময় প্রধান বিচারপতি বলেন, আইন ও বিচার সঠিক পথে থাকলে দুর্নীতি করার আগে দুইবার ভাববে দুর্নীতিবাজরা। দুর্নীতির বিচার দ্রুততার সাথে শেষ করতে এ ধরনের মামলার প্রতি আদালত বিশেষ গুরুত্ব দেয় বলেও জানান প্রধান বিচারপতি।

অনুষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবেদন করায় দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ছয় জন সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান বিচারপতি। নির্বাচন কমিশনের দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রথম পুরস্কার পান বৈশাখী টেলিভিশনের প্রতিবেদক কাজী ফরিদ। সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পান *দৈনিক দেশ রূপান্তরের* সিনিয়র রিপোর্টার তোফাজ্জল হোসেন রুবেল।

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় দুদক প্রাঙ্গণে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২'-এর উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় ইশতাহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা করেছিল। মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। চতুর্থবারের মতো পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর ১৩ই জানুয়ারি ২০১৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে কার্যালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, দেশের উন্নয়নের

ধারা অব্যাহত রাখতে এবং এর অর্জনসমূহ সমুন্নত রাখার জন্য সরকার দুর্নীতিবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি ও মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তীতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে দুর্নীতিবিরোধী সুনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যারা দুর্নীতিতে জড়িত, তাদের আত্মশুদ্ধি চর্চা করতে হবে; আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে; তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ ও গণমাধ্যমের সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

দুর্নীতিবিরোধী আইনকানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এসব বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। চরিত্রনিষ্ঠা আনয়নের জন্য মানুষের জীবনের একেবারে শুরু থেকে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতা জাগ্রত করতে বিদ্যালয়ে 'সততা স্টোর' করার উদ্যোগ নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। 'সততা স্টোর' এমন একটি দোকান যেখানে কোনো বিক্রেতা থাকে না। ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে উল্লিখিত মূল্য বাক্সে রেখে চলে যান।

দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতেই এগিয়ে চলছে সরকারের কার্যক্রম। এ বিষয়ে কঠোর অবস্থানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যত প্রভাবশালী এবং সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন দলের যত ঘনিষ্ঠ জনই হন না কেন, ছাড় পাচ্ছেন না কোনো অপরাধীই। কারও ব্যক্তিগত অপরাধের দায় নিতেও নারাজ সরকার ও দল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের এই কঠোর অবস্থান সুশীল সমাজসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতিগুলোতেও অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রতিফলন রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।' স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দায়িত্ব পালনে সুনাম বৃদ্ধি করুক। শক্তিশালী ভূমিকা পালন করুক দুদক। দুর্নীতি দমনে জয়ী হোক অদম্য বাঙালি। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হোক আপামর জনগণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান সুদৃঢ় হোক। দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক। বাংলাদেশ হোক দুর্নীতিমুক্ত– এই প্রত্যাশাই করি কায়মনোবাক্যে।

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ: সংগঠক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক,
varnobanondo@gmail.com

৬৪ জেলা ও ৪২১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ

দেশের ৬৪ জেলা ও ৪২১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪ জেলায় ও প্রায় ১ হাজার ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়া আরও ২২ উপজেলায় নির্মাণকাজ চলমান। মোট ৪৭০ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ২০৩টি স্মৃতিসৌধ ও ৩৮টি জাদুঘরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৪৮টি স্মৃতিসৌধ ও ২৭টি জাদুঘরের নির্মাণকাজ চলমান। ৯ই নভেম্বর ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

সভায় জানানো হয়, ২ হাজার ৮১০টি বীর নিবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৭ হাজার ৪১৬টি বীর নিবাসের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ৪ হাজার ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩০ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করা হবে। আরও জানানো হয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বরাদ্দকৃত মোট ১ হাজার ১১৮ দশমিক ৭৩ কোটি টাকার বিপরীতে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ৩০১ দশমিক ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এ বছরের মোট এডিপি বরাদ্দের ২৬ দশমিক ৯২ শতাংশ।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়), উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্যানোরোমা নির্মাণ (কারিগরি সহায়তা), বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান *অপারেশন জ্যাকপট* বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া আরও ৩টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন: শায়লা আক্তার

বিজয়ের কথা বলছি

অদ্বৈত মারুত

আজ এই ডিসেম্বরে যখন আমাদের বিজয়ের কথা বলছি
পেছনে তাকিয়ে দেখি– একটি, দুটি করে ইতোমধ্যেই
আমরা পেরিয়েছি পঞ্চাশটি জ্বলজ্বলে আগুনের বছর!

পঞ্চাশ! অথচ প্রতিটি ক্ষণে, মননে, চেতনায় সমন জারি করে
স্মৃতি হয়ে আছে বেদনা– ভেসে উঠছে সেই খরস্রোতা নদী,
মজা পুকুর, দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু আকাশ আর দুঃসহ রাত;
স্টেনগান...
মুক্তিসেনানীর দীপ্ত মুখ– বুকে চেপে ধরে অনিশ্চিত গন্তব্যের
পথে
হেঁটে চলা সেই আতঙ্কিত মাকে, যাকে পাকি কুত্তার ঔদ্ধত
বেয়নেট
খামচে ধরেছিল; খুবলে ছিঁড়ে খেয়েছিল দুধের শিশুপুত্রকে,
কন্যাকে!

পোড়ানো বাড়ি থেকে আত্মচিৎকার; লুটপাট, রক্তমাখা কাপড়
কুয়োভর্তি ক্ষতবিক্ষত লাশ– রাস্তায়, ডোবায়, খালের জলে
ভাসতে থাকা– এখানে সেখানে পড়ে থাকা গলিত দেহ নিয়ে
কাক
শেয়াল-কুকুরের তুমুল টানাটানি– আহা, জানাজা শেষে কবরে
শুতে পারেননি লাখ লাখ তরতাজা প্রাণ; মন্দিরের পুরোহিত–
আগুন গোলায় পুড়তে থাকে হৃদয়ে নিয়ে শ্যামলিমা বাংলাদেশ!

পিতার হুকুম ছিল– যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর
মোকাবিলা করার।
এই রক্তমাখা ভূমি থেকে রক্তপিপাসু দানব হঠিয়ে সমুজ্জ্বল
বাংলাদেশ গড়ার।
নয়টি মাস যেন নয়, নয় বিলিয়ন কোটি মাস যেন জেঁকে
বসেছিল হৃদয়ে বাংলার
পাক হায়েনার ঔদ্ধত হুংকার, রাজাকার, আলবদর, আলশামসের
নিষ্ঠুর হানায়
রক্তাক্ত লাল সূর্য পথে-ঘাটে, নগরে-বন্দরে, শহরে-গাঁয়ের পথ
ধরে মাঠ ভাসাবার–
তীব্র বাসনা ধূলিসাৎ করে আমরা উড়িয়ে দিয়েছি লাল-সবুজ
পতাকা আমাদের।

আহা, সেই রক্তাক্ত দিনের কথা ভুলিয়ে দিতে চায় নব্য
রাজাকার, হায়েনার দল!
অথচ পিতা জেগে আছেন, অথচ পিতা আজও তর্জনী উঁচিয়ে
দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।
মুক্তির ভাস্কর্যে দাঁড়িয়ে পিতা– কে শত্রু আমার, মিত্র কে, চিনিয়ে
দিচ্ছেন।

এই বিজয়ের দিনে স্মরণ করছি তোমাকে– হে পিতা, শেখ
মুজিবুর রহমান
লাখো শহিদের স্মৃতি বুকে নিয়ে শপথ করছি–
যতদিন দেহে রবে প্রাণ
ততদিন গেয়ে যাব
হে পিতা, কেবল তোমাদেরই জয়গান।

বঙ্গ বাগানে বঙ্গবন্ধু রক্ত গোলাপ

আতিক আজিজ

বঙ্গ বাগানে তুমি বঙ্গবন্ধু– এক চোখ ধাঁধানো রক্তগোলাপ
তোমার আয়তন এত বিশাল
যা পৃথিবীর মানুষ কখনো দেখেনি।
তুমি ফুটে আছো গোটা মানচিত্রজুড়ে
দুর্ভাগা বাঙালির চোখের সম্মুখে
জীবন্ত তরতাজা এক রক্তগোলাপ।
তোমার সর্বাঙ্গ থেকে সুর ঝরে গান করে
সুগন্ধে তোমার ভরে যায় বাঙালির ইতিহাস।
তবু মনুষ্যত্বহীন কিছু কিছু জীব থাকে
কোনো সুগন্ধই যাদের স্পর্শ করে না
ইতিহাসের সেই কালো মানুষগুলো
হিংসার অন্ধকারে আজও পথ খোঁজে
আজো রক্তাক্ত করে তোমার অস্তিত্ব
ভাবে, রক্ত ঝরতে ঝরতে রক্তগোলাপ
এইবার ধ্বংস হয়ে যাবে।
কিন্তু তা হয় না কখনো
আপন শক্তিতে তুমি জ্বলে উঠো
পরিপূর্ণ হয়ে যাও অবিকল আগের মতোই
আগের মতোই গোটা মানচিত্রজুড়ে
জ্যোতির্ময় তরতাজা এক ফুটন্ত গোলাপ।
এইভাবে বার বার লক্ষ হাজার কোটিবার
প্রতিবারই একই ফল
তবু বেহায়া পাকিদের ও দেশীয় বেজন্মাগুলোর চোখ কেন যে খোলে না!
বঙ্গবাগানে তুমি ফুটন্ত গোলাপ মানেই স্বাধীন পতাকা, স্বাধীন বাংলাদেশ।

বিজয়ের সুর

প্রজীৎ ঘোষ

জয় বাংলা! বাংলার জয়!
যখন এই বিজয়ের ধ্বনি কানে বাজে
তখনই হৃদয়ের মাঝখানটা গর্বে ভরে যায়
সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত পরাজয় সরে যায়
ছোট্ট মনে দোয়েলের মতো শিস দিয়ে যায় বিজয়ের সুর
সেই সুর বড়ো মধুময় ভরে দেয় হৃদয়ের অচিনপুর।

মনের মণিকোঠায় নিঃসঙ্কোচে ধ্বনিত হয়
লাল-সবুজ এই বিজয় পতাকার উপাখ্যান
যে উপাখ্যানে রয়েছে আড়াইশত বছরের গ্লানির আস্তরণ
যে উপাখ্যানে রয়েছে ইংরেজদের শাসন-শোষণ
অন্যায়-অবিচার আর প্রবঞ্চনা।

সেইসব পরাজয়, ব্যর্থতা আর গ্লানির দাগ মুছে ফেলে
উনিশশো একাত্তরে পাকিস্তানিদের হটিয়ে
বীর সন্তানেরা দিয়েছে স্বাধীনতার দীপ্ত প্রদীপ জ্বেলে।
সেই সুর আজো ভেসে বেড়ায় বাতাসের কার্নিশে
জয় বাংলা!
সে তো বিজয়ের এক দীপ্ত প্রতিচ্ছবি।

ছবির নাম বঙ্গবন্ধু

মো. আজগর আলী

এই ছবি আমাদের জাতির পিতার, বাঙালির আত্মপরিচয়ের,
এই ছবি আমাদের অবিনাশী আত্মার,
জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের ।
এই ছবির প্রতীক একটি লাল-সবুজের পতাকা,
যা হাজার বছরের আলোকবর্তিকার সমাহার।
এই ছবি নীল আসমানের নীচে বিশাল জমিনে সুশোভিত ও
সুবিন্যস্ত চাদর।
আর এই চাদর সবুজ প্রান্তরে সদা বিচরণ করে অমরত্ব বরে;
এই ছবি কথা বলবে কাল থেকে কালান্তরে;
লোক-লোকান্তরে শত্রুর দাঁতাত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে;
এই ছবির আবেশ অফুরান শক্তির,
যেমন রয়েছে জয়গান, মুক্তির
তেমন হৃদয়ে জাগায় চেতনা, ভক্তির।
এই ছবি স্বপ্নিল ভুবনে প্রেরণার উৎস,
তারুণ্যের উদ্যম ও উচ্ছ্বাসে ভরপুর,
এই ছবি বাঙালির আত্মোপলব্ধির ও আত্মজাগরণের।
এই ছবি বন্দির বন্দনায় অস্থির;
এই ছবি মুক্তির জয়গান করে উন্নত শিরে;
এ ছবি মুক্তিকামী মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে তোলে রণ হুংকার;
এই ছবি মন্ত্রের ন্যায় মুগ্ধ, শ্রোতার
দিক নির্দেশনার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর,
এই ছবি ৭ই মার্চ ১৯৭১-এ গর্জে ওঠা তর্জনীর ডংকার।
এই ছবি হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে উদারতার
এক মহান উপহার।
এই ছবি এক বিশ্ব নেতার,
শান্তির প্রতীক জুলিও কুরির,
এই ছবি অথৈ পাথারে গুরুগম্ভীর,
এই ছবির মহান ব্রত আত্মত্যাগের,
এই ছবি লড়াই করতে শিখিয়েছে, আমাদের
শত জুলুম-নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতার।
এই ছবি রক্তস্নাত বত্রিশ নম্বরের,
এই ছবি জাতীয় শোকগাথায় অনন্ত চরাচরে,
আমাদের অস্তিত্বের বিমূর্ত আসরে।
এই ছবি সমগ্র বাংলাদেশের ,
এই ছবি বঙ্গবন্ধুর, আমাদের আজন্ম ভালোলাগার,
যুগ-যুগান্তরে, মহাপ্রলয়ের পরে,
শেষ বিচারে,
এই প্রশস্তি পরম সৃষ্টিকর্তার তরে।

বিজয়মালা

মিতা চক্রবর্তী

রক্তাক্ত স্বাধীনতা
বাংলার ইতিহাস।
আমার দেশে বইছে আজ
স্বাধীনতার বাতাস।

বলছি কথা– গাইছি গান
হাসছি স্বাধীনভাবে।
সবার সাথে তাল মিলিয়ে
চলছি সবার সাথে।

মায়ের মুখে– বাবার কাছে
গল্প যখন শুনি
হৃদয় কেঁপে ওঠে, মাগো!
কী করুণ ধ্বনি!

কত কষ্ট– কত ব্যথা
হারিয়েছি স্বজন।
একই ভূখণ্ড ফিরে পেয়ে
সবাই হয়েছি আপন।

বাংলা আমার জন্মভূমি
আমি বাংলার সন্তান
জীবন দিয়ে রাখি যেন
বাংলা মায়ের মান।

মিথ্যে-মায়া-প্রলোভনে
মন যেন না ভোলে।
দেশপ্রেম থাক হৃদয়জুড়ে
এই ব্রত নিই তুলে।

স্বাধীনতার মর্মবাণী
আছে হৃদয়জুড়ে।
বিজয়মালা সজীব থাক
বাংলার ঘরে ঘরে।

যুব উন্নয়নে সরকারের নানা পদক্ষেপ

লায়লা জাহান

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' –এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২২' উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১লা নভেম্বর 'জাতীয় যুব দিবস ২০২২' উদ্‌বোধন এবং 'জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যুবকদের কর্মসংস্থানে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। কাজ কোনোটাই ছোটো নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে-কোনো কাজ করে নিজের অর্থ নিজে উপার্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কারণ কোনো কাজকে আমরা ছোটো করে দেখি না। কোনো কাজকে আমরা ছোটো করে দেখব না। করোনার সময় ছাত্রদের আহ্বান জানালে তারা কৃষকদের ধান কেটে দিয়েছে যা অত্যন্ত গর্বের বিষয় উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, ঠিক এভাবেই যুবসমাজ যে-কোনো কাজ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখবে, যা আমাদের দেশকে উন্নত করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুবকদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই। আর সেই দিকে লক্ষ রেখেই সারা দেশে আমরা হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, বিশেষায়িত ল্যাব, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি, যেখানে আমাদের যুবসমাজ প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। কারণ আমি বিশ্বাস করি আমাদের যুবসমাজ মেধাবী এবং তারা সব কাজেই পারদর্শিতা দেখাতে পারবে। ২০০৮-এর নির্বাচনি ইশতাহারে 'রূপকল্প-২০২১'-এর মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা তাঁর সরকারের একটি লক্ষ্য ছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর মাঝে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি এবং উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। আর এই মর্যাদা ধরে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে সেজন্য সরকার 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা আমাদের দেশ দিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতেই আমাদের এদেশকে গড়ে তুলতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালে আমাদের যুবকরাই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেই আমাদের জন্য বিজয় অর্জন করেছে। সেই বিজয়ী জাতি হিসেবে আমাদের সবসময় মাথা উঁচু করে চলতে হবে। তিনি বলেন, কারও কাছে হাত পেতে নয়, আমরা নিজের দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করব নিজের শক্তি, মেধা, সম্পদ দিয়ে। এই চিন্তা আমাদের যুবকদের মাঝে সবসময় থাকতে হবে। এটা সম্ভব হলেই জাতির পিতার ভাষায় 'বাংলাদেশকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না।'

যুবরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। যুবরা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও অমিত শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এদেশের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দেশ মাতৃকার অধিকার রক্ষায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবায় এদেশের যুবসমাজ তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুবদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার দেশ পুনর্গঠনে তাদের অংশগ্রহণ

নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে-কোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ, রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট–২০৩০-কে সামনে রেখে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হচ্ছে যুবসমাজের শোভন কর্মসংস্থান (ডিসেন্ট ওয়ার্ক), যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্তকরণ। তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজ। তাদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি।

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি যুব কার্যক্রমে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জীবন দক্ষতা, শিক্ষা ও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০ হাজারের অধিক যুব সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুব সমাবেশ, যুব মেলার আয়োজন, যুব বিনিময় কর্মসূচিসহ মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে যুবদেরকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি এবং চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়নে যুবদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমান সরকারের যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল থেকে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৬০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য় দফায় যথাক্রমে ১২ হাজার, ১৬ হাজার ও ২০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্যের নিদর্শন স্বরূপ ১০ই জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩.৫০ লক্ষ টাকা হারে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালার আলোকে ৮টি বিভাগীয় জেলায় এ ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুব নারী তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় সাত হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করে থাকে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে নিজেদের কর্মসংস্থান ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি জেলায় ও ১০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি যুগপৎভাবে যুববান্ধব এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

লায়লা জাহান : প্রাবন্ধিক

শেখ জামালকে নিয়ে দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০২২' উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের *রণাঙ্গনের ডায়েরি* এবং *শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল : দেশপ্রেম ও তারুণ্যের দীপ্ত শিখা* শীর্ষক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। ২১শে নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগে বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি।

রণাঙ্গনের ডায়েরি বইতে মূলত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রশিক্ষণের সময় লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তার একটি ধারাবাহিক বর্ণনা তাঁর নিজ হাতে লেখা ডায়েরি থেকেই ছাপানো হয়েছে। এছাড়া শেখ জামাল যখন যুক্তরাজ্যের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি একাডেমিতে কমিশনের জন্য যান তখন তাঁর নিজের জীবনের ওপর একটি মূল্যায়ন লিখেছিলেন, সেটিও এই বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটিতে মোট চারটি ছবি, ১২২টি পৃষ্ঠায় তাঁর ডায়েরির বর্ণনাসহ মোট ১৩৬টি পৃষ্ঠা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অকাল প্রয়াত ছোটো ভাই শেখ জামালকে নিয়ে দ্বৈত ভাষায় রচিত *শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল: দেশপ্রেম ও তারুণ্যের দীপ্ত শিখা* বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন যা বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিবেদন: নিঘাত সুলতানা

দ্বিতীয় জীবন

দিলরুবা নীলা

'তুম মুক্তি হ্যায়, তুমকো খতম কর দেগা।'

কথাটি শোনার সাথে সাথে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল আলমের।

ঘাড় ঘোরাতে সাহস পাচ্ছিল না। পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে মনে মনে আন্দাজ করতে পারছিল যে সে বর্তমানে পৃথিবীর একজন জঘন্যতম মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে সন্দেহাতীতভাবেই বন্দুক এবং সেটি থেকে গুলি বেড়িয়ে আসা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

আলমের কথার সত্যতা মিলল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। তার কাঁধে রাইফেল ধরা। পাকিস্তানি সেনা তার শার্টের কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে গানবোটে তুলল এবং হাজির করল মেজরের সামনে।

আঙুর ফলের মতো টকটকে চেহারার মেজর বসেছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনার সাথে।

আলম একশো পারসেন্ট নিশ্চিত যে, তারা বসে বসে কঠিন কোনো ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশকে যুদ্ধে পরাজিত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া তাদের মাথায় বর্তমানে কিছু আছে বলে মনে হয় না।

আলমের খুব ইচ্ছে করছিল ওদের ভীষণ রকম একটা বকা দিতে। খুব কষ্টে নিজেকে সে সংযত রাখল।

আলম নিজেকে সংযত করতে পারলেও মেজর সংযত থাকল না। সে আগুন রাঙা চোখে তাকালো আলমের দিকে।

'শালা শেখ মুজিবকা বাচ্চা, তুম মুক্তি হ্যায়, তুমকো খতম কর দেগা।'

চিৎকার করে কথাটা বলেই সে তাকালো এক সেনার দিকে।

সাথে সাথেই সেই সেনা আলমের শরীর থেকে শার্ট খুলে ফেলে এবং বুকের উপর সাদা চক জাতীয় কিছু একটা দিয়ে বৃত্ত এঁকে মাঝে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে দেয় এবং পিছন থেকে দুই হাত বেঁধে ফেলে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে আলম। সে মনে মনে দোয়া পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটা দোয়াও মনে আসে না বরং চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা স্মৃতি। প্রিয় গ্রাম গগন। সুপারি আর নারকেল গাছে ঘেরা এ গ্রামে তার এক পা দুপা করে বেড়ে ওঠা, কে. পি. ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাটানো কৈশোর, কবি নজরুল কলেজ। আহা! কী সুন্দর সেই সব দিন। কলেজ পাস করে তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ানো।

বছর খানেক আগে বিয়ে করা সুন্দরী বউ। হঠাৎ আলমের মনে হয়। আজ বাড়ি থেকে বের হবার সময় বউটা কী যেন বলতে চেয়েও আবার বলল না। লজ্জা পেয়ে সরে গেল। আলমের মনে হলো সে জানে তার বউটা কী বলতে চেয়েছিল।

কিছুদিন ধরে বউটার লুকিয়ে লুকিয়ে আচার খাওয়া তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তাহলে কী তার বউটা পোয়াতি?

না আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। সে একশোভাগ নিশ্চিত আজই তার জীবনের শেষ দিন। বাঘের মুখ থেকে কেউ কোনোদিন ফেরে না।

আলম চিরকাল সব ধরনের ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে। নিজের জীবন আর প্রিয়জন এরাই তার কাছে প্রিয়।

তাইতো মুক্তিযুদ্ধ একটি ন্যায়সংগত যুদ্ধ জেনেও দেশের এ দুর্দিনে সে যুদ্ধে যায়নি। মনে মনে গুমরে মরছে ঠিকই।

কিন্তু আজকের দিনের বোকামির কথা মনে পড়ে ভীষণ রাগ হয় আলমের।

সে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাই স্কুলের কাজে

তাকে প্রায়ই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যাতায়াত করতে হয়।

শিক্ষা অফিস বরিশাল।

আজ সে বরিশাল পৌঁছালো ঠিকঠাক মতোই। কিন্তু বরিশাল পৌঁছে নৌবন্দরে গিয়ে নৌবাহিনীর জাহাজে সুসজ্জিত কামান, মেশিনগান দেখতে ভীষণ কৌতূহল হয় আলমের। সাত পাঁচ না ভেবেই সে সোজা চলে যায় নৌবন্দরে। সেখানে দুটি নেভি জাহাজ এবং গানবোট বাঁধা। জেটিতে গিয়ে সে উঁকিঝুঁকি মেরে জাহাজে সজ্জিত অস্ত্র পরখ করে দেখছিল। আর তারপরেই যা হওয়ার তাই হলো। পাকিস্তানি সেনার হাতে মুহূর্তেই ধরা পড়ল সে। এই মুহূর্তে তার চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

আলম আর অন্য কিছুই ভাবতে চায় না। অনিবার্য মৃত্যুর স্বাদ কেমন হবে ভাবনায় এটাই আনার চেষ্টা করতে লাগল।

আলমের মৃত্যু ভাবনা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ দৈববাণীর মতো একটি কণ্ঠস্বর ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল– 'সাব উসকো ছোড় দেগা, ও লোক মেরা ভাই হ্যায়, মুক্তি নেহি, কৃষক হ্যায়।' আলম চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে জেটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পানের দোকানদার যে অনেকক্ষণ ধরে তাদের সব কথা শুনছিল। ঐ দোকানদারের কাছ থেকে বোটের সেনারা পান-সিগারেট কিনে খেত। তাই তারা অতি সহজেই তার কথা বিশ্বাস করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেজর আলমকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

নতুন জীবন ফিরে পেয়ে আলম বাড়ি ফিরে আসে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় তার নতুন জীবনটা সে দেশের জন্য উৎসর্গ করবে।

কী হয়েছে? বরিশাল থেকে ফিরে আসার পর কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলে।

কোনো সমস্যা?

বউ মারিয়ার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দেয়ালের দিকে ফিরে শোয় আলম।

বলবে তো কী হয়েছে? আমার কোনো অপরাধ?

মারিয়ার দিকে ফিরে শোয় আলম। আমি যুদ্ধে যেতে চাই।

মানে কী? হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত।

কোনো মানে নেই। আমি একজন শিক্ষক, দেশের এ দুর্দিনে আমার উচিত দেশকে সাহায্য করা।

তোমার যদি কিছু হয়ে যায়?

হলে হবে।

তোমার সন্তান, আমি?

আমাদের কী হবে?

আমি ফিরে আসব ইনশাল্লাহ।

মারিয়া আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় আলমকে জড়িয়ে ধরে সে আলমের বুকে নিরাপত্তা খোঁজে। পরদিন হাজারও চেষ্টা করে আলমকে বাড়িতে রাখা যায় না। যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে চলে যায় সুন্দরবন ক্যাম্পে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে আলম শিখে ফেলে অস্ত্র চালানো, জেনে ফেলে এল.এম.জি কাকে বলে, স্টেনগান কী।

কিছুদিন পর মারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আলমকে দেখে চিনতে পারে না মারিয়া।

মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় উসকো-খুসকো চুল, না জানি কতদিন মাথায় চিরুনির আঁচড় পড়েনি।

কবে ফিরবা বাড়ি?

মারিয়া জানতে চায়।

এইতো আর কিছুদিনরে বউ। ওরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আমাদের স্বাধীনতা খুব বেশি দেরি নাই। আলমের চোখ আনন্দে চকচক হয়ে ওঠে। যেমনি হুটহাট করে এসেছিল তেমনি হুটহাট করে চলে যায় আলম।

আলমদের দুই গ্রাম পরেই সুরুজ আলী মাতবরের গ্রাম। সুরুজ আলী মাতবর আজ রাতে মুক্তিবাহিনীর একটি দলকে দাওয়াত দিয়েছে। হঠাৎ এ দাওয়াতের কারণ বুঝতে পারে না মুক্তিযোদ্ধারা। খুব সাবধানে রাতের অন্ধকারে তারা সুরুজ আলী মাতবরের বাড়ি যায়। সুরুজ আলী মাতবর অতিশয় ধনী লোক বিধায় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও বিশাল।

অনেকদিন পর মুক্তিযোদ্ধারা পেট পুরে খায়। খাওয়া শেষ করে চলে আসতে চাইলেই বাঁধা দেয় সুরুজ আলী মাতবর।

আরে এত তাড়া কীসের? পাশের বাড়ি দই পাততে দিছি। দই খাইয়া তারপর যাইবা।

মুক্তিযোদ্ধার দলটি দইয়ের অপেক্ষায় বসে থাকে। তাছাড়া এসময়ে তাদের কোনো অপারেশন ছিল না।

একটি ঘরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল মুক্তিবাহিনী। হঠাৎ গানবোট ভেড়ার শব্দ পায়– বুঝতে পারে মিলিটারি আসছে। এটা যে সুরুজ আলী মাতবরের কারসাজি বুঝতে বাকি থাকে না কারো। কমান্ডারের ইশারায় মুক্তিবাহিনীর সবাই ঠিকঠাক পজিশন নেয়। তুমুল গুলি ছোড়াছুড়ি হয়।

আলমও গুলি ছুড়ছিল তার পজিশনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটি চিৎকার, 'মুক্তিকো পাকড়াও'।

হঠাৎ আলম নিজেকে আবিষ্কার করে এক পাকসেনার বাহুতে।

আলম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এক মেজরের সামনে।

'তুম লোক মুক্তি হ্যায়।'

আলম চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, অ্যাম লোক মুক্তি হ্যায়।

আলমের চিৎকারে আকাশ কেঁপে ওঠে।

আলম জানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার লাশ ঢলে পড়বে মাটিতে।

সে চোখের সামনে তার আট মাসের পোয়াতি বউয়ের ছবি দেখতে পায়। সে বলছে,

'তুমি না থাকলে আমাদের কে দেখবে?'

আলম মনে মনে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া মনে করতে চায়। যে দোয়া পড়লে আসন্ন বিপদ দূর হবে। সে লাভ করবে নতুন তৃতীয় জীবন। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কোনো দোয়াই মনে পড়ছে না।

৩ ডিসেম্বর ২০২০, ২৯তম আন্তর্জাতিক ও ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২০ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে

প্রতিবন্ধীরা বোঝা নয়, সম্পদ

জেসিকা হোসেন

১৯৯২ সাল থেকে ৩রা ডিসেম্বর 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সারা দেশে ৩১তম আন্তর্জাতিক ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক এই দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনমুখী পদক্ষেপ: প্রবেশগম্য ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব বিনির্মাণে উদ্ভাবনের ভূমিকা' প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধিশীল সমাজ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' প্রণয়ন করেছে। এ আইন দুটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবাধ চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগসহ সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দফতর হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক ও রেফারেল সেবা প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব সেবা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৬,৮৮,১৪৯ জন এবং সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ৯২,১৯,৫৮৮টি। অন্যদিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৪,২২,১৯৯ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ১০,১২,১১৩টি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান ছাড়াও সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ এবং স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ৬০,৩৪২টি সহায়ক উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতামাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সারা দেশে ৭৪টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ১০,৮৮৯ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরের লালবাগ, উত্তরা, যাত্রাবাড়ী এবং রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, গাইবান্ধা জেলা ও সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় একটিসহ মোট ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে মোট ১৬০ জন অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে সর্বমোট প্রায় ১৬ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জুলাই

২০২১ সালে ২৬৯টি বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালে দুই দিনের মেলা থেকে ৪০ জন এবং ২০১৮ সালের মেলা থেকে ৬৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেয়েছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ২৯ জন পরিচয়হীন প্রতিবন্ধী এতিম শিশুকে লালনপালন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালিত হচ্ছে। চাকরি প্রত্যাশী ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৪০ আসন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০০ জন।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্বরে ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর পাঁচ দিন মেয়াদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরিকৃত বিভিন্ন হস্তশিল্প, নকশিকাঁথা, তৈরি পোশাক, শাড়ি, খেলনা, প্লাস্টিক দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী দ্রব্য সামগ্রি প্রদর্শন, বিক্রি ও বিপণন করা হয়।

বাংলা ইশারা ভাষা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে ৫০ জন বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০০ জন মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪-এ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডরমেটরি, অডিটোরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৫ই ডিসেম্বর ২০১৯ 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স' (সুবর্ণ ভবন) শুভ উদ্‌বোধন করেন। বর্তমানে ভবনটিতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সাভার উপজেলাধীন বরাইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমির উপর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পটি গত ১৬-০৩-২০২১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ঢাকায় মিরপুরে ৩রা ডিসেম্বর '৩১তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু –পিআইডি

শেখ হাসিনার সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সমাজের সকলেরই উচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল আর্থসামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, তবেই প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদে পরিণত হবে।

জেসিকা হোসেন: প্রাবন্ধিক

জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২২

সাভারে শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ষষ্ঠবারের মতো 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। পদক বিজয়ী ও মনোনীতদের উদ্দেশে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)-এর চেয়ারপারসন এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, নিজের মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম থাকে, তাহলে নিজের দেশের মানুষের জন্য সবকিছু করা সম্ভব। তিনি বলেন, নিজের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনা যদি না থাকে, তাহলে দেশের ভালো কীভাবে চাইতে পারি? তিনি আরও বলেন, আমার বিশ্বাস আপনারাই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করবেন। আর এটা আমাদের জীবদ্দশার মধ্যেই হবে। নিজেদের পরিশ্রম, মেধা দিয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ইয়াং বাংলার কার্যক্রম নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এবারের পুরস্কারের জন্য প্রায় ছয়শো প্রতিষ্ঠান আবেদন করে। তাদের মধ্য থেকে ২৮ জনকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য বাছাই করা হয়। ৫টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয় ১০টি প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়া দুজনকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা।

প্রতিবেদন: মোবিন হক

বিমান ও মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ

হেলাল হোসেন কবির

সামনের দিনে হয়ত নতুন চমক দেখাতে পারে আমাদের দেশ। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। বিমান ও মহাকাশ নিয়ে দারুণভাবে গবেষণার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সরকার। আর সেই উদ্যোগ ইতোমধ্যে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

দেশের উত্তরের জেলা লালমনিরহাট। সেখানে ঐতিহ্য স্থানের একটি ব্রিটিশ আমলের বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরটি চালু করার জন্য স্থানীয়রা দাবি করতে থাকে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই স্থানটিকে এক ভিন্ন রূপ দিলেন।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থাপন করে বিমান ও মহাকাশ গবেষণায় দেশের প্রথম বিশেষায়িত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়। এ যেন নতুন চমক হয়ে যায় দেশবাসীর কাছে। সেখানে বেশ কিছু বিষয়ের উপর ইতোমধ্যে ক্লাস চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশেই তৈরি হবে বিমান। সেই মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে আসবে সেই দিকটাও আনন্দের বিষয়।

শিক্ষকরাও যেন বিএসএমআরএএইউকে বিমান ও মহাকাশ গবেষণার উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত করতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। খোলামেলা পরিবেশ, মুক্ত আকাশ সব মিলিয়ে যেন আকাশ গবেষণার জন্য চিন্তা শক্তি অর্জনের দারুণ ভাব প্রকাশ করা যায়।

২০১৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেশের অর্থায়নে নির্মিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের অন্যতম বিশেষায়িত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এটি।

প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকার আশকোনায় ১১ একর জমির ওপর অস্থায়ীভাবে চলে। তারপর চলতি বছরের ৩রা জুলাই লালমনিরহাট ক্যাম্পাস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার একাডেমিক সেশন শুরু হয়।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি এভিয়েশন হারে রূপান্তরের পরিকল্পনা করছে।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত বর্ধনশীল এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস সেক্টরের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে বিএসএমআরএএইউ একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

চলতি বছরের ৩রা জুলাই লালমনিরহাটের এই ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে একাডেমিক সেশন উদ্‌বোধন করেন বর্তমান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান। তিনি সেসময় বলেন, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের এ জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ফলে বর্তমান সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সবার জন্য অংশগ্রহণমূলক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হয়েছে এবং এ অঞ্চলের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

বিএসএমআরএএইউ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি স্বপ্নের প্রকল্প। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস শিক্ষায় অত্র অঞ্চলে একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্সে' পরিণত হবে। আর এভাবেই এগিয়ে যাবে বিমান ও মহাকাশ গবেষণা।

হেলাল হোসেন কবির: কবি, প্রাবন্ধিক ও নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আলোর মনি, লালমনিরহাট

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সশস্ত্রবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২১শে নভেম্বর ২০২২ সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন –পিআইডি

এসময় সশস্ত্রবাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রপতি শিখা অনির্বাণে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি শিক্ষাসহ যে-কোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জোর তাগিদ দেন। রাষ্ট্রপতি ও আচার্য মোঃ আবদুল হামিদ ১৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি, শিক্ষক এবং তরুণ গবেষকদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনা ও গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলুন যাতে তাদের এজন্য বিদেশে পাড়ি দিতে না হয়। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক, আর তা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

৩১তম আন্তর্জাতিক ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২২

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ গুণের অধিকারী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সার্বিক সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধা ও দক্ষতাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হলে তাদের উপযুক্ত পরিচর্যা ও প্রশিক্ষিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এবং তাদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, সমন্বিত প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, থেরাপি সেবা, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। ৩রা ডিসেম্বর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপনকালে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এবছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনমুখী পদক্ষেপ: প্রবেশগম্য ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব বিনির্মাণে উদ্ভাবনের ভূমিকা'।

রাষ্ট্রপতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসিক বিকাশে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, দেশি-বিদেশি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করছি। জাতির পিতার নির্দেশে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে ফোর্সেস গোল–২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২১শে নভেম্বর 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

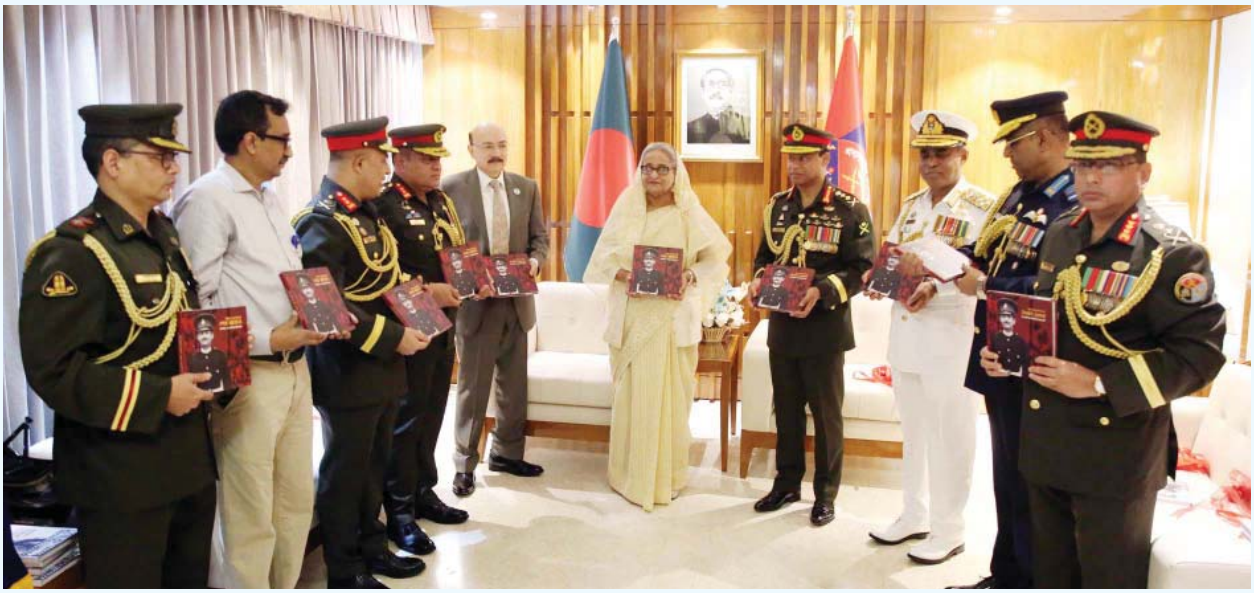

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০২২' উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ কার্যালয়ে দ্বৈত ভাষায় রচিত 'শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল: দেশপ্রেম ও তারুণ্যের দীপ্ত শিখা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

এসময় প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০২২ উপলক্ষে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সব সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। একইসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্রবাহিনীর সব শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা এ দিনে সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন। এর ফলে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতিবছর ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস পালন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্রবাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। এভাবে সশস্ত্রবাহিনী আজ জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আবাদি জমি রক্ষায় পরিকল্পিত শিল্পায়নের আহ্বান

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আবাদি জমি রক্ষায় পরিকল্পিত শিল্পায়নের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, যত্রতত্র কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে না। আবাদি জমি ও ফসলি জমির কোনো ক্ষতি করা যাবে না। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০শে নভেম্বর সারা দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে (ইপিজেড) ৫০টি শিল্প ইউনিট, প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধা উদ্‌বোধনকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছি বলেই ২০২১ সালে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এটা ধরে রাখতে হবে। সেজন্য আমাদের ব্যাপক শিল্পায়ন দরকার। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিসহ নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে এবং জনগণের আর্থসামাজিক উন্নতি করে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে নিজস্ব বাজার সৃষ্টি হয়। সরকার সে কারণেই সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এবং প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই বেশ কয়েকটি ইপিজেড নির্মাণ করেছি।

অগ্নিনির্বাপণকারীরা দুঃসময়ের বন্ধু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অগ্নিনির্বাপণকারীরা দুঃসময়ের বন্ধু। সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পূর্ণ সক্ষমতার সর্বোচ্চ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছে। ১৫ই নভেম্বর 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০২২' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় তিনি গণভবন থেকে মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত মূল আয়োজনে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, সেবার ক্ষেত্র এবং কর্তব্যরতদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ আগুন লাগলে বা কোনো দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্প বা কোনো কিছু ঘটলে অথবা কোনো ভবন ধসে গেলে ফায়ার সার্ভিসই সকলের আগে ছুটে যায়। এমনকি কোনো জাহাজ বা লঞ্চ যখন দুর্ঘটনায় পড়ে তখনো এই ফায়ার সার্ভিসকেই আমরা পাই। তাই তাদেরকে আরও যুগোপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেই পদক্ষেপই আমরা নিয়েছি। এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-প্রতিরোধে সহায়তা অব্যাহত থাকবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। টাইপ-১ ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে ইনসুলিন দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে। ১৪ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'আগামীতে নিজেকে সুরক্ষায় ডায়াবেটিসকে জানুন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ডায়াবেটিস একটি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ। কাজেই যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং যাদের নেই উভয়কেই এর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং নিজেকে সুরক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের সেরা অনুকূল গন্তব্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। এর ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে এখন বিনিয়োগ ও সোর্সিংয়ের জন্য সর্বাধিক অনুকূল গন্তব্য হয়ে উঠেছে। দেশের বিনিয়োগবান্ধব নীতি একইসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করছে। ১৩ই নভেম্বর বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) আয়োজিত 'মেইড ইন বাংলাদেশ উইক ২০২২'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি বিনিয়োগ ও সোর্সিংয়ের জন্য বাংলাদেশকে বেছে নিতে বিদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে দেশের ব্যবসায়ী নেতাদেরও অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু রপ্তানি করলেই চলবে না, নিজের দেশের ভেতরেও বাজার সৃষ্টি করতে হবে এবং করোনাকালীন সরকার যতটা সম্ভব তৃণমূলে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া ও সরবরাহ করা যায় সেটা করেছে। এতে মানুষের ভেতর হাহাকার আসেনি। তিনি আরও বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে যে প্রভাব ফেলবে সেজন্য আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে এরই মধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে, সেজন্য আমরা প্রস্তুত, আমরা তৈরি করছি।

আমাদের দেশেও বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ রয়েছে উল্লেখ করে সেই সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে, ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে আমরা যুক্ত হচ্ছি। তাছাড়া আমরা ওটারওয়েজ, এয়ারওয়েজ, রেলসহ সবকিছুতেই উন্নয়ন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যার ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত থেকে অর্জিত হয়েছে ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ১৩ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে অর্জিত রপ্তানি আয়ের চেয়ে ১০ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

দু'দেশের মধুর সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু, যা আমরা কখনো ভুলবো না এবং বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের এই মধুর সম্পর্ক ধরে রাখতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ভারত সফরকালে ১লা নভেম্বর নয়াদিল্লির প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন তিনি। তিনদিনের এই সফরে মন্ত্রী এর আগে কলকাতা প্রেসক্লাব এবং ইন্দো-বাংলা প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এদিন প্রথমে প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার উদ্‌বোধন করা বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টারে যান তিনি এবং সেখানে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি উমাকান্ত লাখেরা, সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার ও সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিড়ীসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ মতবিনিময়ে যোগ দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমরা শুধু নিজেদেরই নয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় বিশ্বাস করি। তিস্তা নদীর পানি বণ্টনে চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেবল তিস্তার ওপর নির্ভর করে না, আরও অনেক ইস্যু আছে। আমাদের সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে লেখা। তিস্তার সমাধান হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থান নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে। সংখ্যলঘু বলে বাংলাদেশে কিছু নেই, আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকার এবং দল অসাম্প্রদায়িকতা ও সব ধরনের মানুষের সম্প্রীতি ও বন্ধনে বিশ্বাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো দুর্গাপূজায় এবার আগের বছরের চেয়ে ৭ হাজার পূজামণ্ডপ বেশি হয়েছে। দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে এবার বাংলাদেশে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বিষয় গণমাধ্যমের মাধ্যমেই দু'দেশের মানুষ জানবে এবং পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দেশের গণমাধ্যম প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মুক্তমত প্রকাশ ও বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে বলেই গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম পুরোপুরি স্বাধীন। গণমাধ্যমে মুক্তমত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছে গণমাধ্যমকর্মীরা। দৃষ্টান্ত দিয়ে

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরেই দেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। এক সময়ে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যম বিটিভি ছাড়া অন্য কোনো টেলিভিশন ছিল না। বর্তমান সরকারের আমলে ৪০টির উপরে বেসরকারি টেলিভিশন রয়েছে। আমার মন্ত্রণালয়ে কমপক্ষে ৫ হাজার অনলাইন পোর্টালের নিবন্ধনের আবেদন রয়েছে, যা রীতিমতো অকল্পনীয়।

গণমাধ্যমের প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর আহ্বান

তামাক, তামাকজাত পণ্য, সিগারেট, ইলেকট্রনিক সিগারেট ও সীসায় আসক্তি রোধে ভূমিকা রাখতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। ২২শে নভেম্বর রাজধানীতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনে 'উন্নয়ন সমন্বয়'

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ২২শে নভেম্বর ২০২২ ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণে গণমাধ্যমের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

সংস্থা আয়োজিত 'তামাকজাত পণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণে গণমাধ্যমের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। সংস্থার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

তিনি বলেন, সিগারেটের পাশাপাশি এখন উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ক্যাফেতে সীসাবারে গিয়ে সীসা পান, ইলেকট্রনিক সিগারেট পান একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তরুণ ছেলেমেয়েরা এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা রোধ করতে গণমাধ্যম নানাভাবেই ভূমিকা রাখতে পারে। মন্ত্রী বলেন, এখন ৩৬টির মতো টিভি চ্যানেল। তারা ভেপিং মেশিন, ইলেকট্রনিক সিগারেট ও সীসার ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর নিয়মিত প্রতিবেদন করতে পারে। অন্য গণমাধ্যমও এটি করতে পারে। অপকারিতা ছাড়া এগুলোর কোনো উপকারিতা নাই। সুতরাং এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। তামাকজাত পণ্য আমদানি ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ করে অনলাইনে অর্ডার বন্ধ করতে এসব বিষয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে চিঠি দেওয়ার পরামর্শ দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ।

সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ৩০শে নভেম্বর সচিবালয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) প্রকাশিত *বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০* ইংরেজি গ্রন্থ এবং তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত *সমৃদ্ধির সোপানে স্বদেশ* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, ডিএফপির পরিচালক মোহাম্মদ আলী সরকার এসময় বক্তব্য দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে খাদ্যপণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। আমাদের দেশেও বেড়েছে কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে কম। আর করোনা মহামারির মধ্যেই আমাদের মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে ৩ হাজার ডলার ছুঁয়েছে, পদ্মা সেতু হয়েছে এবং মেগা প্রকল্প মেট্রোরেল, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেলের কাজও সমাপ্তির পথে। অর্থাৎ যে যাই বলুক, সত্যিকার অর্থেই সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ এবং সমৃদ্ধিকে টেকসই করতে আগামী একশো বা আশি বছর পরে আমরা বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চাই, কী রকম হওয়া উচিত, সেই লক্ষ্যেই দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বদ্বীপ পরিকল্পনা–২১০০ প্রণয়ন করেছি।

সচিব হুমায়ুন কবীর বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ ও মহামারির ধকলে বিশ্বমন্দার এই পরিস্থিতিতে ভালো থাকার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে উৎপাদন। সেজন্যই প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অভূতপূর্ব উন্নতি অর্জন করেছে এবং অনাগত প্রজন্মের জন্য টেকসই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রেখে যেতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ বেড়েছে ৪৭ শতাংশ

২০২২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসহ মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড থেকে এ বছর জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৬৯ হাজার ৬০২

জন। গত বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল এক লাখ ৮৩ হাজার ৩৪০ জন। সে তুলনায় জিপিএ ৫ বেশি পেয়েছে ৮৬ হাজার ২৬২ জন বা ৪৭ শতাংশ। এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পাসের হার ৮৭.৪৪ শতাংশ। ২৮শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যালয়ে তাঁর কাছে এসএসসির প্রস্তুতকৃত ফলাফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। প্রধানমন্ত্রী ফলাফল উদ্‌বোধনের পর দুপুর ১টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ফল বিশ্লেষণ করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তাঁর কার্যালয়ে ২৮শে নভেম্বর ২০২২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলের অনুলিপি এবং পরিসংখ্যান প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুর হাসান চৌধুরী –পিআইডি

ফলাফল প্রকাশ উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান বাড়াতে হবে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করানোর মধ্যেই কৃতিত্ব বেশি। এমন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা উচিত বলেও জানান তিনি। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করাসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় ভালো ফল করায় তিনি শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে পাসের হার। গত বছর শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৯৩.৫৮ শতাংশ হলেও এ বছর পাসের হার ৮৭.৪৪ শতাংশ। অর্থাৎ পাসের হার ৬ শতাংশ কমে গেছে। এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯ লাখ ৯৪ হাজার ১৩৭ শিক্ষার্থী, যার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬১৯ জন। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত পাঁচ বছরে পাসের হারে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রীরা। পাসের হারের পাশাপাশি গত চার বছর জিপিএ ৫ পাওয়ার দিক থেকেও এগিয়ে তারা।

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্রীদের পাসের হার ৮৭.৭১ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৮৭.১৬ শতাংশ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা আট লাখ ৭৩ হাজার ৫৭৩ জন। সেখানে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা আট লাখ ৭০ হাজার ৪৬ জন। অর্থাৎ ছাত্রদের তুলনায় তিন হাজার ৫২৭ জন বেশি ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এ সাফল্য অর্জন করছে ছাত্রীরা। সেসময় ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৭৮.৮৫ শতাংশ, যেখানে ছাত্রদের পাসের হার ৭৬.৭১ শতাংশ।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের পেছনে রয়েছে করোনায় পরীক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ ছাড়। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রস্তুতি থাকার কারণেই সাফল্য মিলেছে। এ বছর পরীক্ষার্থীদের অনলাইনে ও অফলাইনে পুরো সময় পাঠদানের আওতায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রথম ফ্লিট রিভিউ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কক্সবাজারের ইনানীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ ২০২২ (আইএফআর ২০২২)। ৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত আইএফআর ২০২২-এর শুভ উদ্‌বোধন করেন। বিশ্বের মোট ২৮টি দেশের নৌবাহিনীর প্রধান ও উচ্চপদস্থ নৌ প্রতিনিধিগণ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ বিশ্বের ৭টি দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্‌ট এবং হেলিকপ্টার আইএফআর-এ অংশগ্রহণ করেছে। চার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি ৬ই ডিসেম্বর শুরু হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত আমাদের পররাষ্ট্র মূলনীতি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'– এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আইএফআর ২০২২-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'সীমানা ছাড়িয়ে বন্ধুত্ব' (Friendship Beyond the Horizon)।

সামুদ্রিক জাতি সত্তার এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের

মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধিতে ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নৌবাহিনীর প্রথা অনুযায়ী 'শিপ্স বেল' বাজিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্‌বোধন করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ আগত বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের নৌবাহিনীর জাহাজ, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার এবং বিশেষায়িত বোটের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ ফ্লিট রিভিউ পরিদর্শন হয়। এসময়ে জাহাজসমূহ 'জয় বাংলা' স্লোগানে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্যরাও পাবেন নগদ প্রণোদনা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশবাহিনীর সদস্যরা বিদেশে থাকাকালীন সময়ে অর্জিত অর্থ বৈধ পথে দেশে পাঠালে রেমিট্যান্সের অর্থের বিপরীতে মিলবে সরকারের নগদ প্রণোদনা। ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, এখন থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের অর্জিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে। এই নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের ওপর ২ শতাংশ নগদ এবং ১লা জানুয়ারি ২০২২ থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের ওপর ২.৫ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে।

পরিচয়হীনরাও পাচ্ছে জন্মসনদ

উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পর গত চার মাসে 'মাতৃ ও পিতৃপরিচয়হীন' সাড়ে আট লাখ ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়। এর মধ্যে পথশিশু, ভবঘুরে, পরিচয়হীন, বেদে, যৌনকর্মী, পথবাসী ও ঠিকানাবিহীন অনেকেই রয়েছেন। নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে এসব ব্যক্তিকে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আগের নিয়মে মা-বাবার জন্ম নিবন্ধন থাকলেই কেবল ২০০১ সাল ও তার পরে জন্ম নেওয়া সন্তানরা জন্ম নিবন্ধন করার সুযোগ পেতেন। আর যারা মাতৃ ও পিতৃপরিচয়হীন, তাদের জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আসতে নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের সফটওয়্যারে কোনো সুযোগই রাখা ছিল না।

কিন্তু পথশিশুদের জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে গত ২০শে জুলাই হাইকোর্ট সবার জন্ম নিবন্ধন করার সুযোগ দিতে নির্দেশ দেয়। উচ্চ আদালতের সেই নির্দেশনার পর গত ২৬শে জুলাই মা-বাবার জন্ম নিবন্ধন থাকার বাধ্যবাধকতা সফটওয়্যার থেকে তুলে সবাইকে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ করে দেয় রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়। রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ের সার্ভারের সফটওয়্যারে পরিবর্তন আনার পর থেকে সুযোগটি সৃষ্টি হয়।

এর পর গত ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত মা-বাবার জন্ম নিবন্ধন তথ্য ছাড়াই ৩৪ লাখ ৫৬ হাজার ৭৫৭ জনের জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে। এর মধ্যে পিতামাতার 'নামবিহীন' জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৬ লাখ ৭২ হাজার ৯৫ জনের, পিতামাতা 'নেই' এমন জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার ৪৬৮টি, পিতামাতা 'অজ্ঞাত' এমন জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১১ হাজার ৯৪৯টি এবং পিতামাতা 'অপ্রাপ্য' এমন জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৩০টি।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়'

ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে 'বিনিময়'। ১৩ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এটি উদ্‌বোধন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা (অবৈতনিক) সজীব ওয়াজেদ জয় ১৩ই নভেম্বর ২০২২ রাজধানীর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে ওয়েবভিত্তিক ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্ম 'বিনিময়'-এর উদ্‌বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক –পিআইডি

'বিনিময়' ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যা একটি সেবা হিসেবে ব্যাংক, এমএফএস ও পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরের নিজস্ব অ্যাপে যুক্ত হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে। এটি তৈরিতে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে ভেলওয়্যার লিমিটেড,

মাইক্রোসফট বাংলাদেশ ও ওরিয়ন ইনফরমেটিকস লিমিটেড। বিনিময় প্ল্যাটফর্মটি রক্ষণাবেক্ষণ করবে ভেলওয়্যার লিমিটেড।

১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনে আইডিটিপির খরচ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিকাশ থেকে রকেটে টাকা পাঠাতে (প্রতি হাজারে) খরচ হবে ৫ টাকা। আর এমএফএস সেবা (বিকাশ, রকেট ইত্যাদি) থেকে ব্যাংকে টাকা পাঠাতে (প্রতি হাজারে) খরচ হবে ১০ টাকা। অপর দিকে এমএফএস থেকে পেমেন্টে সার্ভিস প্রোভাইডারের (পিএসপি) অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে খরচ হবে হাজারে ৫ টাকা।

প্রথমবারেই ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের বাজিমাত

ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াডে ধারাবাহিক সাফল্যের পর এবার ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডে (ডব্লিউআরও) প্রথমবার অংশ নিয়েই দশম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ৬৬টি দেশ থেকে ২০০ দলের অংশগ্রহণে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড। ২০শে নভেম্বর ডব্লিউআরও সেক্রেটারি জেনারেলের উপস্থিতিতে অনলাইনে এর ফল ঘোষণা করে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড অ্যাসোসিয়েশন।

ডব্লিউআরও-এর ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের 'টিম প্রডিজি' দশম স্থান অর্জন করে। এ দলের সদস্য ছিল ডা. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ ইসলাম এবং নটর ডেম কলেজের তৌসিফ সামিন। অন্যদিকে ওপেন ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়ে ১৬তম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এ ক্যাটাগরিতে অংশ নেওয়া টিম 'পাওয়ারিয়াম' -এর সদস্য ছিল নটর ডেম কলেজের শিক্ষার্থী আশরাফুজ্জামান ফুয়াদ, ঢাকা কলেজের মুহাম্মদ আবরার জাওয়াদ এবং সরকারি বিজ্ঞান কলেজের তানজিম জামান খান।

বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) এ অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ পর্ব আয়োজন করার পাশাপাশি অনলাইনে আন্তর্জাতিক পর্ব সমন্বয় করে। কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেডের ভেন্যু সহযোগিতায় অনলাইনে ডব্লিউআরও-এর মূল পর্বে অংশ নেয় বাংলাদেশ। এই অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী দলগুলো তাদের দেশের জাতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এই আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়। এ বছর অলিম্পিয়াডের 'ওপেন ক্যাটাগরি' এবং 'ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স' ক্যাটাগরিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ। অনলাইনের মাধ্যমে অলিম্পিয়াডটি জাজমেন্ট এবং মনিটর করে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড আয়োজক কমিটি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কক্সবাজারের সুপারি বিদেশে

কক্সবাজারে এবার সুপারির বাম্পার ফলন হয়েছে। জেলার ৩,৫০০ হেক্টর জমিতে প্রায় ১,২৭,৫০,০০০টি গাছে ১২,২৫০ মেট্রিক টন সুপারি উৎপাদিত হয়েছে। প্রতি টন সুপারি বিক্রি হয় দুই লাখ টাকায়, যার মূল্য ২৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয়েছে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায়।

প্রায় ২,২৮০ হেক্টর জমিতে সুপারি চাষ হয় উখিয়া ও টেকনাফে। এ অঞ্চলের সুপারির দেশ-বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। প্রতিদিন কক্সবাজারের বিভিন্ন বাজার থেকে সুপারি যায় ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। দেশের বাইরেও যায় কক্সবাজারের সুপারি। ইংল্যান্ড, কানাডা, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে কক্সবাজারের সুপারি।

উখিয়ার সোনারপাড়া সুপারি বাজারে সপ্তাহের দুই হাটে কোটি টাকারও বেশি সুপারি বেচাকেনা হয়। ঢাকা থেকে সুপারি কিনতে আসা ব্যবসায়ীদের মতে, সারা দেশে কক্সবাজারের সুপারির কদর বেশি। এছাড়া কক্সবাজারের পাইকারি বাজারগুলোতে সুপারি খুবই সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সুপারি ঢাকায় মজুত করা হয়। এসব সুপারি ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যায়, রপ্তানি করা হয় বিদেশেও।

বাংলাদেশের রিকশা যাচ্ছে ইউরোপে

বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে ব্র্যান্ডিং করতে দেশের রিকশা ইউরোপে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ম্যানচেস্টার মিউজিয়ামের এশিয়ান গ্যালারিতে দর্শনার্থীদের রিকশায় চড়ার স্বাদ পূরণ করবে ঢাকার রিকশা। ২০শে নভেম্বর বিজিএমইএ কার্যালয়ে দেশকে ব্র্যান্ডিং করতে বিজিএমইএ'র নতুন উদ্যোগ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের প্যাডেল চালিত রিকশার ঐতিহ্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবী তরুণদের সংগঠন 'উই লাভ রিকশা'। রিকশার ইউরোপ যাত্রায় উই লাভ রিকশা সংগঠনের সঙ্গে বিজিএমইএ, ম্যানচেস্টার মিউজিয়াম, ব্রিটিশ কাউন্সিল কাজ করছে। প্রথমে দুটি রিকশা পাঠানো হচ্ছে, একটি ম্যানচেস্টার মিউজিয়ামের এশিয়ান গ্যালারিতে প্রদর্শনীর জন্য, অন্যটি দর্শনীয় স্থানগুলোতে দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

সাহিত্যে কারকাস পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের তন্বী

বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের লেখক তন্বী নন্দিনী ইসলাম এ বছর কারকাস রিভিউ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২৭শে অক্টোবর সেরা ছয় ননফিকশনের মধ্যে তন্বীর *ইন সেনসোরিয়াম: নোটস ফর মাই পিপল* বইটি বেস্ট ননফিকশনের খেতাব জিতে নেয়। ৫ই নভেম্বর সংবাদ মাধ্যমে এ খবর ছাপা হয়। গত বছর কারকাস তালিকায় সবচেয়ে স্টার পাওয়া ১৪৩৬টি বই থেকে চূড়ান্ত বইগুলো বেছে নেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত বইটি তন্বীর দ্বিতীয় বই। এটি প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা হারপার কলিন্স থেকে। বিচারকদের মতে, সাহসী, উদ্ভাবনী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং গীতিময় অলংকারিক লেখার জন্য বইটি পুরস্কার জিতে নিয়েছে। তন্বী ১০ বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে স্থায়ী হন নিউইয়র্কে। তিনি

যুক্তরাষ্ট্রের কথাসাহিত্যিক ও ব্রুকলিনের প্রসাধন ও সুগন্ধি প্রতিষ্ঠান তানাইসের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের পুস্তক পর্যালোচনা বিষয়ক সাময়িকী কারকাস রিভিউ এ পুরস্কার দিয়ে থাকে।

ফুটবল বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে ছয় নারী

প্রথমবারের মতো ছেলেদের বিশ্বকাপ ফুটবলে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে নতুন এক ইতিহাস গড়তে চলেছেন ছয় জন নারী। তাদের মধ্যে তিন জন আবার প্রধান রেফারির হিসেবে মাঠে থাকবেন। আর বাকি তিনজন সহকারী রেফারি দায়িত্ব পালন করবেন। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে তিনজন মূল নারী রেফারি হলেন ফ্রান্সের স্তেফানি ফ্রাপা, রুয়ান্ডার সালিমা মুকানসাঙ্গা ও জাপানের ইয়োশিমি ইয়ামাশিতা। সহকারী রেফারি হিসেবে থাকবেন ব্রাজিলের নিউজা ব্র্যাক, মেক্সিকোর কারেন দিয়াজ মেদিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথরিন নেসবিট।

স্তেফানি ফ্রাপা: ৩৮ বছর বয়সি স্তেফানি ফ্রাপা ফ্রান্সের হার্বলে-সার-সেইনে বেড়ে উঠেছেন। ১৩ বছর বয়স থেকেই প্রতি শনিবার তিনি ফুটবল খেলতেন আর রবিবারে রেফারির দায়িত্ব পালন করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার বিষয় হিসেবে খেলাধুলাকেই বেছে নিয়েছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পরবর্তীতে স্তেফানি ইউরো, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। এছাড়া নারী বিশ্বকাপতো বটেই, আন্তর্জাতিক অনেক ম্যাচেই বাঁশি বাজানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে এই নারীর।

সালিমা মুকানসাঙ্গা: ৩৪ বছর বয়সি সালিমা মুকানসাঙ্গা প্রথম আফ্রিকান নারী হিসেবে আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে ম্যাচ পরিচালনা করেন। সালিমার কৈশোর কাটে রুয়ান্ডার রুশিজি অঞ্চলে। তিনি নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যায় পড়াশোনা করেন। স্কুলের শেষ বর্ষে বিদ্যালয়ের এক ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম রেফারির দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০০৪ সালে প্রথমবারের মতো প্রধান রেফারি হিসেবে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলে মাঠে নামেন সালিমা। ১৯ হাজার ফুট উচ্চতার মাউন্ট কিলিমাঞ্জেরোতে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত ফুটবল ম্যাচে রেফারি ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ফিফা নারী বিশ্বকাপেও রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সালিমা মুকানসাঙ্গা।

ইয়োশিমি ইয়ামাশিয়া: জাপানের ইয়োশিমি ইয়ামাশিয়া টোকিওর নাকানো ওয়ার্ডে বেড়ে উঠেছেন। পড়াশোনা করেছেন টোকিওর গাকুগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার বছর বয়সে প্রথম পায়ে ফুটবল নেন ইয়ামাশিয়া। বড়ো ভাইয়ের কাছে ফুটবল খেলা শিখেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিভিন্ন প্র্যাকটিস ম্যাচে সহকারী হিসেবে কাজ করেন তিনি। ইয়ামাশিয়া এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করেন। টোকিও অলিম্পিক ও ২০১৯ সালে ফ্রান্সের ফিফা নারী বিশ্বকাপে রেফারি হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিগুণ হলো মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ভাতা

মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তায় ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ হলো। আগে এটি সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা ছিল, এখন তা বেড়ে হয়েছে দুই লাখ টাকা। এই অর্থ সরকারি হাটবাজারের ইজারার আয় থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হবে।

তবে আগের মতোই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সরকারি হাসপাতালে জটিল ও সাধারণ চিকিৎসার জন্য সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা সহায়তা পাবেন। আগে জীবনে একবার এ সহায়তা পেলেও এখন এটি প্রতিবছরের জন্য প্রদান করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিদ্যমান নীতিমালা বাতিল করে অধিকতর যুগোপযোগী করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নতুন নীতিমালায় মূলত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে জটিল রোগের চিকিৎসায় স্বাভাবিক বরাদ্দের বাইরে অতিরিক্ত এক লাখ টাকা দেওয়া হতো, সেখানে এখন দুই লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে। এছাড়া পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাছাড়া মোটামুটি আগের নীতিমালা বহাল আছে।

নতুন 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারি হাটবাজারের ইজারার আয়ের ৪ শতাংশ অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২১' থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ২০২১ সালের নীতিমালা বাতিল করে ১৬ই নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সরকারি হাটবাজারের ব্যবস্থাপনা ইজারা পদ্ধতি ও এ থেকে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এবং একই বিভাগের ২০১২ সালের ৭ই মে-এর পরিপত্র অনুযায়ী দেশের সরকারি হাটবাজারের ইজারার আয়ের ৪ শতাংশ অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক হিসাবে জমা করার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

সহায়তা পাচ্ছেন ৩৮ হাজার কৃষক

রাজশাহীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৩৭ হাজার ৭শ' জন কৃষককে ৩ কোটি ৫

লাখ ৫১ হাজার ৭৫০ টাকার সার ও বীজ সহায়তা দিবে সরকার। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং চলতি বছরের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি খাতে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এবারের বরাদ্দ খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২২ হাজার ৫০০ জন কৃষককে সরিষা বীজে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৭ হাজার বেশি। তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই প্রণোদনা। সরকার কৃষি খাতের এই ফসলে এবার সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। ২১শে নভেম্বর রাজশাহী জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় জেলায় রবি ২০২২-২০২৩ মৌসুমে ৩৭ হাজার ৭শ' জন কৃষকের জন্য ৩ কোটি ৫ লাখ ৫১ হাজার ৭৫০ টাকার সার ও বীজ বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রবি মৌসুমে ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারি, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ, টমেটো, মরিচ এবং পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলার নয়টি উপজেলার অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে এই বীজ ও সার বিতরণ করা হবে।

তথ্যে জানা যায়, কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার এক বিঘা জমির জন্য গম বীজ-২০ কেজি, সরিষা ফসলের জন্য বীজ-১ কেজি, ডিএপি-১০ কেজি, এমওপি-১০ কেজি, চিনাবাদাম ফসলের জন্য বীজ-১০ কেজি, সূর্যমুখী ফসলের জন্য বীজ (হাইব্রিড)-১ কেজি, মসুরের জন্য বীজ-৫ কেজি, ডিএপি-৫ কেজি, এমওপি-৫, খেসারির জন্য বীজ-৮ কেজি, ডিএপি-৫ কেজি, এমওপি-৫ কেজি, টমেটোর জন্য বীজ-০.০৫ কেজি, ডিএপি-১০ কেজি, এমওপি-১০ কেজি এবং মরিচ ফসলের জন্য বীজ-০.৩০০ কেজি, ডিএপি-১০ কেজি, এমওপি-৫ কেজি উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

সংযুক্ত নীতিমালা মোতাবেক এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ১ (এক) কেজি করে বোরো ধান হাইব্রিড বীজ, ২০ (বিশ) কেজি করে গম বীজ অথবা ০২ (দুই) কেজি করে ভুট্টা বীজ অথবা ০১ (এক) কেজি করে সরিষা বীজ, ০৫ (পাঁচ) কেজি করে শীতকালীন/ গ্রীষ্মকালীন মুগ বীজ অথবা ১০ শতক জমির জন্য ০.২৫০ কেজি পেঁয়াজ বীজ পাবেন। এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা হিসেবে বোরো ধান, গম ও সরিষা ফসলের জন্য অনুমোদিত তালিকাভুক্ত চাষিরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ১০ (দশ) কেজি ডিএপি ও ১০ (দশ) কেজি এমওপি সার এবং গ্রীষ্মকালীন মুগ ও শীতকালীন মুগ ফসলের জন্য অনুমোদিত তালিকাভুক্ত চাষিরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ১০ (দশ) কেজি ডিএপি ও ০৫ (পাঁচ) কেজি এমওপি সার পাবেন। অনুরূপভাবে ভুট্টা ফসলের জন্য চাষিরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ২০ (বিশ) কেজি ডিএপি ও ১০ (দশ) কেজি এমওপি সার এবং পেঁয়াজ ফসলের জন্য অনুমোদিত তালিকাভুক্ত চাষিরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ০৫ (পাঁচ) কেজি ডিএপি ও ০৫ (পাঁচ) কেজি এমওপি সার সহায়তা পাবেন।

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোছা. উম্মে ছালমার তথ্যে জানা যায়, বিশ্বব্যাপী মন্দায় ও খাদ্য ঘাটতি পূরণে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং চলতি বছরের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি খাতে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এই সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এবার জেলার নয়টি উপজেলায় ৩৭ হাজার ৭শ' জন কৃষককে ৩ কোটি ৫ লাখ ৫১ হাজার ৭৫০ টাকার সার ও বীজ সহায়তা দিচ্ছে সরকার।

মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষ

মালচিং হচ্ছে চীন- জাপানের বিষমুক্ত সবজি চাষের একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির নাম। বিভিন্ন ধরনের বস্তা দিয়ে যখন গাছপালার গোড়া, সবজি ক্ষেতে ও বাগানের বেডের জমি বিশেষ পদ্ধতিতে ঢেকে দেওয়া হয় তখন তাকে মালচিং পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি লাভবান হওয়ায় সবজি চাষি এ চাষের দিকে ঝুঁকছেন। বাংলাদেশের ৪৯২টি উপজেলার মধ্যে ২০টি উপজেলাতে এ মালচিং পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিকভাবে সবজি চাষ হচ্ছে।

এগ্রি-টেকনোলজি পার্কের উদ্‌বোধন

জাপানি কোম্পানি ইয়ানমার এসিআই মটরসের সহযোগিতায় একটি এগ্রি-টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে। যেখানে ইয়ানমারের আধুনিক ট্রাক্টর, হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, সিডিং মেশিন ও পটেটো হারভেস্টার মেশিন প্রদর্শিত হবে এবং এসব যন্ত্র নিয়ে গবেষকরা গবেষণা করতে পারবে। একই সাথে প্রায় আড়াইশ' কোটি টাকা বিনিয়োগে এসিআইয়ের মানিকগঞ্জে স্থাপিত কৃষিযন্ত্র সংযোজন কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে এসিআই। এসিআই বলছে, জাপানি প্রতিষ্ঠান ইয়ানমারের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ব্যবহার করে বছরে এক হাজার কম্বাইন্ড হারভেস্টার সংযোজন করা হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে এই উৎপাদন সক্ষমতা পাঁচ হাজারে নিয়ে যাওয়া হবে।

১লা নভেম্বর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে টেকনোলজি পার্কের উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষির বড়ো উৎপাদন ধরে রাখতে আমরা ফার্ম ম্যাকানাইজেশনের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি, যা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন কপ-২৭

২৭তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন ৬ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত মিশরের শার্ম এল শেখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব দেশগুলোকে তহবিল সহায়তা দিতে ধনী দেশগুলো 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল গঠনে সম্মত হয়েছে।

'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চরম আবহাওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো ঘটনাগুলোতে ইতোমধ্যে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সেটি বোঝায়। প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী, 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' নামের তহবিল থেকে বিশ্বজুড়ে ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করে টিকে থাকা দেশগুলো সহায়তা পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির জন্য ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থ আদায়ে তিন দশক ধরে দাবি জানিয়ে আসছে দরিদ্র দেশগুলো। ২০শে নভেম্বর তহবিল গঠনে একমত হয় দেশগুলো।

এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ন্যায়বিচারের জন্য এ চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এ নিয়ে জার্মানির জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রী জেনিফার মরগান বলেন, আমরা এ চুক্তিতে রাজি হয়েছি, কারণ আমরা ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর পাশে থাকতে চাই। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু কর্মীরা এবং যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু বিষয়ক সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা ম্যাককার্থি সিএনএনকে বলেন, সময় শেষ হয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিপর্যয়কর বন্যার কথা উল্লেখ করেছেন তারা। ম্যাককার্থি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করা কিংবা এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের টিকে থাকার চেষ্টায় সাহায্য করা উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বদলে যাওয়া পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষয়ক্ষতির ইস্যুটি এবারের মিশরের সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এ নিয়ে কূটনীতিকদের লাগাতার আলোচনার পর ঐতিহাসিক সমঝোতার ঘোষণা এসেছে সম্মেলনে।

প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি না করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকৃতির ক্ষতি করে না এমন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় সংশোধনী এড়িয়ে চলার নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। ২২শে নভেম্বর রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলনকক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন। একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি জানান, ২৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'উপকূলীয় জলবায়ু সহিষ্ণু শহর' প্রকল্প অনুমোদনের সময় প্রধানমন্ত্রী প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট না করে প্রকল্পটি সতর্কতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের কাজ করার নির্দেশনা দেন। বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে মান্নান বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেবল কৃষি উৎপাদন বাড়াতে বলেছেন– এমন নয়, তিনি মানসম্পন্ন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যশস্য এবং ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী গুদামে খাদ্যশস্য মজুত বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্যশস্য সংরক্ষণে উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

আগামী জুনের মধ্যে আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন চালু

রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে নির্মাণাধীন আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত নতুন রেললাইন আগামী জুনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। রেলমন্ত্রী ১১ই ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিদর্শনের সময় আগরতলা সংলগ্ন জিরো পয়েন্ট এলাকায় উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে এ ঘোষণা দেন।

উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল। ছবিটি ঢাকায় মিরপুর ১০নং থেকে তোলা –পিআইডি

তিনি আরও বলেন, উভয় দেশের জন্য আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন সংযোগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লাইনটি চালু হলে দুই দেশের মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, পাশাপাশি মানুষ সহজে দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে।

উল্লেখ্য, আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন প্রকল্পটি ভারতীয় অনুদানে নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৭ শতাংশ। আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ৮ কিলোমিটার। পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, লাকসাম-আখাউড়া প্রকল্পের পরিচালক মো. শহিদুল ইসলাম, পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী ও আখাউড়া-আগরতলা প্রকল্পের পরিচালক আবু জাফর মিয়াসহ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটের কুমারগাঁও-বাধাঘাট-বিমানবন্দর সড়কের চার লেন কাজের উদ্‌বোধন

সিলেটের কুমারগাঁও থেকে বাধাঘাট হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজের উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ২৬শে নভেম্বর সিলেট শহরের তেমুখী পয়েন্টে উদ্‌বোধনী ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে চার লেনের এই সড়ক নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, চার লেনের এই সড়ক নির্মাণ শেষ হলে সিলেট শহর থেকে এয়ারপোর্টে যাওয়া এবং এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসা সহজ হবে। তিনি আরও বলেন, সিলেট-ঢাকা ছয় লেন সড়কের কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে সিলেট-তামাবিল চার লেন সড়কের কিছু টেন্ডার হয়ে গেছে। এ কাজগুলো হয়ে গেলে আধ্যাত্মিক নগরী সিলেটে পর্যটকদের আসা-যাওয়া সুবিধা হবে, আর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হবে সিলেটবাসীর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কুমারগাঁও-বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট চার লেন সড়কের নির্মাণকাজে প্রায় ৭২৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং এখানে অনেকগুলো কালভার্ট হবে, যাতে জলাবদ্ধতা না হয়।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওসমানী বিমানবন্দরে যাতায়াতকারীরাও উপকৃত হবেন। বর্তমানে এ বিমানবন্দরটি দুই লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়কের মাধ্যমে সিলেট নগরীর সাথে যুক্ত। কিন্তু বিমানবন্দরটি বিকল্প সংযোগ সড়ক থাকা প্রয়োজন। কুমারগাঁও-বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট সড়কটি আপগ্রেডেশন হলে এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে। চলতি বছরের ৪ঠা জানুয়ারি 'কুমারগাঁও-বাধাঘাট-বিমানবন্দর সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এ অনুমোদন পায়। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ৭২৭ কোটি ৬৩ লাখ ২০ হাজার টাকা।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে দেশের চার চলচ্চিত্র

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া (আইএফএফআই) চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের চার চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র চারটি হচ্ছে– *নকশি কাঁথার জমিন*, *সাঁতাও*, *পাতালঘর ও পাপ-পুণ্য*।

টিএম ফিল্মসের ব্যানারে ফারজানা মুন্নির প্রযোজনায় *নকশি কাঁথার জমিন* নির্মাণ করেছেন আকরাম খান। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র এটি। এতে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান। চলচ্চিত্রটি আইসিএফটি-ইউনেসকো গান্ধি মেডেল অ্যাওয়ার্ড বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে।

এছাড়াও আইএফএফআইয়ের নন-কমপিটিশন বিভাগের ফিল্ম অব দ্য ওয়ার্ল্ডে প্রদর্শিত হয় খন্দকার সুমন পরিচালিত *সাঁতাও*, নূর ইমরান মিঠু পরিচালিত *পাতালঘর* এবং গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত *পাপ-পুণ্য* চলচ্চিত্র। আইএফএফআইয়ের ৫৩তম আসর এটি। এ উৎসব চলে ভারতের গোয়ায় ২০ থেকে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত। এছাড়া ২৪শে নভেম্বর সকাল ৯টায় *সাঁতাও* এবং আড়াইটায় প্রদর্শিত হয় *পাতালঘর* চলচ্চিত্র। দুটি চলচ্চিত্রই দেখানো হয় আইনক্স পানজিম অডিটরিয়াম ৩-এ।

এদিকে ২৫শে নভেম্বর আইনক্স পানজিম অডিটরিয়াম ১-এ *নকশি কাঁথার জমিন*, একই দিনে আইনক্স পানজিম অডিটরিয়াম ৩-এ সকালে প্রদর্শিত হয় *পাপ-পুণ্য*।

বেগম রোকেয়া পদক ২০২২

'নারী জাগরণের মধ্য দিয়েই আমাদের সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে

৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

বাংলাদেশকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা সেই বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।'

৯ই ডিসেম্বর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২' ও 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য পাঁচ বিশিষ্ট নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' প্রদান করেন। তাঁরা হলেন– রহিমা খাতুন, অধ্যাপক কামরুন নাহার বেগম, অ্যাডভোকেট ফরিদা ইয়াসমীন, ড. আফরোজা পারভীন ও নাসিমা বেগম। তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণপদক, চার লাখ টাকার চেক ও সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল।

এছাড়া বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিসিএলে চ্যাম্পিয়ন উত্তরাঞ্চল

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ২৭শে নভেম্বর বিসিএলের ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে রোমাঞ্চকর ম্যাচে ৩ রানে জিতেছে মাহমুদুল্লাহ-লিটন দাসদের উত্তরাঞ্চল। টুর্নামেন্টে এর আগে সব ম্যাচ জেতা দক্ষিণাঞ্চল হারল ফাইনালে এসেই।

বিসিএলের দশম আসরের ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলকে ২৪৪ রানের টার্গেট দেয়। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪১ রান করে দক্ষিণাঞ্চল। ফলে ৩ রানে জয় পায় উত্তরাঞ্চল। গত বছর থেকে বিসিএলের প্রথম শ্রেণির ম্যাচের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ওয়ানডে সংস্করণ। প্রথমবার দুই সংস্করণেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মধ্যাঞ্চল। এবার প্রথমবারের মতো ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতল উত্তরাঞ্চল।

২০২৩ বিশ্বকাপে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ

২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত

৭ই ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানী ঢাকার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতকে হারিয়ে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে জয়োল্লাসে বাংলাদেশি ক্রিকেট দল

হয়ে গেছে বাংলাদেশের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার হারের কারণে এই সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিশ্বকাপের আগে আরও দুটি সিরিজ বাকি থাকলেও ভারতের টিকিট নিশ্চিত করেছে লাল সবুজের দল। আইসিসির ধরাবাঁধা সময় থেকে এই পর্যন্ত খেলা ছয় সিরিজের ১৮ ম্যাচ খেলে ১২টি জিতেছে তামিম ইকবালের দল। মোট পয়েন্ট ১২০। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও স্বাগতিক ভারত।

২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২৯শে নভেম্বর বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিটও নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান দল। বিশ্বকাপ সুপার লিগে ১৪ ম্যাচে ১১ জয়ে সব মিলিয়ে ১১৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম দেশ হিসেবে ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের যুবাদের জয়

পাকিস্তান যুব দলের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে জয় পেয়েছে বাংলাদেশের যুবারা। পাকিস্তানের মুলতান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১০ই নভেম্বর ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের ৭ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ৫০ ওভারের খেলায় টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ২০২ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান যুব দল। স্বাগতিকদের হয়ে সর্বোচ্চ ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন আরাফাত মিনহাজ। ২০২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সফরকারী বাংলাদেশের দুই ওপেনার চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং আশিকুর রহমান শিবলি জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করেন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

না ফেরার দেশে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক আলী ইমাম

আফরোজা রুমা

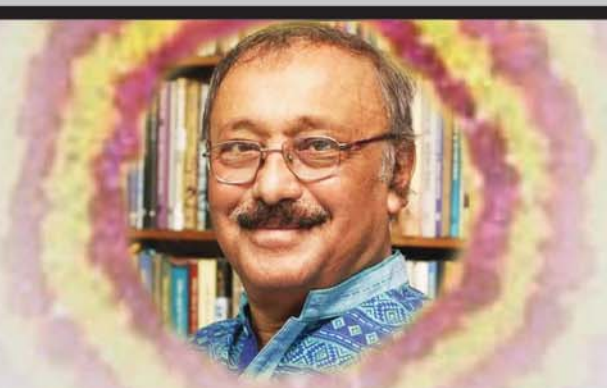

বরেণ্য শিশু সাহিত্যিক, শিশু সংগঠক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আলী ইমাম চলে গেলেন না ফেরার দেশে। দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়াসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন এই সাহিত্যিক। ২১শে নভেম্বর রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন আলী ইমাম। জন্মের ছয় মাস পরই পুরো পরিবারসহ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। থাকতেন পুরানো ঢাকার ঠাটারীবাজারে। তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে পুরানো ঢাকার ওয়ারী, লিঙ্কন রোড, নয়াবাজার, নওয়াবপুর, কাপ্তানবাজার, ফুলবাড়িয়া এলাকায়।

আলী ইমাম ছয়শোরও বেশি বইয়ের লেখক ছিলেন। শিশু মনস্তত্ব, রোমাঞ্চ এবং মানবতা ধরনের বিষয় তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে। তিনি সহজসরল ভাষায় লিখতেন। তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, রোমাঞ্চকর উপন্যাস ও ইতিহাস সংশ্লিষ্ট রচনা লক্ষণীয়। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অধুনালুপ্ত চ্যানেল ওয়ানে ২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর তিনি ইউনিসেফের 'মা ও শিশুর উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্প'- এর পরিচালক ছিলেন। ওই দায়িত্ব পালনকালে ২০০০ সালে জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত 'প্রি জুঁনেসি চিলড্রেনস টিভি' প্রোডাকশন প্রতিযোগিতার জুরির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'সার্ক অডিও ভিজ্যুয়াল বিনিময়' অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী। টেলিভিশন ও বেতারে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের নির্মাতা ও উপস্থাপক হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা বিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'হ্যালো, আপনাকে বলছি' (১৯৯৯-২০০৪) নামে তাঁর উপস্থাপিত সরাসরি অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলাদেশ টেলিভিশনে ওই সময়ের আলোচিত প্রামাণ্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া' (১৯৮০- ১৯৮৭)–এর আলোচিত প্রযোজক ছিলেন আলী ইমাম। তাছাড়া কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে তিনি একাধিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। লেখালেখি ছাড়াও অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবস্থাপক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন।

শিশুসাহিত্য ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ফিচার, ভ্রমণ কাহিনি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– সোনালী তোরণ (১৯৮৬), আলোয় ভুবন ভরা (১৯৮৭), দুঃসাহসী অভিযাত্রী (১৯৮৮) সেসুলয়েডের পাঁচালী (১৯৯০), রক্ত দিয়ে কেনা গল্প (১৯৯২), ভিনদেশী কিশোর গল্প (১৯৯১) , বাংলাদেশের কথা (১৯৯২), বিদেশি পর্যটকদের চোখে বাংলাদেশ (১৯৯৪), দূরের দ্বীপ কাছের দ্বীপ (১৯৯৬), প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধ বিহার (১৯৯৬), বাঙলা নামে দেশ (১৯৯৭), দেখো রে নয়ন মেলে (১৯৯৯)। ভ্রমণ কাহিনি: কাছে থেকে দূরে (১৯৯১)। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– ধলপহর (১৯৭৯), হিজল কাঠের নাও (১৯৮৬), তোমাদের জন্যে (১৯৯৪), সবুজ খাতা (১৯৯৬), ঘাসের ডগায় হলুদ ফড়িং (১৯৯৯)।

শিশুসাহিত্য: দ্বীপের নাম মধুবুনিয়া (গল্প, ১৯৭৫), অপারেশন কাঁকনপুর (উপন্যাস, ১৯৭৮), রুপোলী ফিতে (গল্প, ১৯৭৯), শাদা পরী (গল্প, ১৯৭৯) পাখিদের নিয়ে (১৯৭৯)। কিশোর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে– রক্তপিশাচ তিতিরোয়া (১৯৮৬), ভয়াল ভয়ঙ্কর (১৯৮৭), নীল শয়তান (১৯৮৭), ভয়ঙ্করের হাতছানি (১৯৯০), ইয়েতির চিৎকার (১৯৯০), নীল চোখের ছেলে (১৯৯২), লড়াই (১৯৯২), জীবনের জন্য (১৯৯৪), রহস্যময় (১৯৯৬), দানব পাখির রহস্য (১৯৯৯), অচল ছবি সচল হলো (১৯৯৯)।

বিবিধ: তাঁর সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে রয়েছে– গল্পগুলো ইতিহাসের (১৯৯৯), মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় (২০০০), রক্তের বিনিময়ে (২০০০), তারার আলোয় ঝিকিমিকি (২০০১), রহস্যের খোঁজে (২০০১), গল্পসমগ্র (২০০২) ও ছয়টি সায়েন্স ফিকশন (১৯৯৪)।

জীবনী: শেষ নেই (১৯৭৯), ধূসর পুঁথি (১৯৮০), জীবন বাংলাদেশ মরণ বাংলাদেশ (১৯৮১), ফোটে কত ফুল (১৯৯১) এবং আলোর চিঠি (১৯৯৯)। **বিজ্ঞান:** বিস্ময়কর বিজ্ঞান; রহস্যময় বিজ্ঞান (১৯৮৮), রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান (১৯৮৯), জানার আছে অনেক কিছু (১৯৯৬) এবং সংকলন: কিশোর সমগ্র (১৯৯৬)।

পুরস্কার: ইকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), নেধুশাহ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৯০) ও বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য ২০০১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১২ সালে শিশু একাডেমি শিশুসাহিত্য পুরস্কার পান আলী ইমাম। এছাড়াও শিশু সাহিত্যিক হিসেবে জাপান ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে ২০০৪ সালে তিনি সমগ্র জাপান পরিভ্রমণ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহে বিতর্ক এবং উপস্থিত বক্তৃতায় চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৮৬ সালে ইউনেসকো আয়োজিত শিশুসাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রকাশনা বিভাগের ন্যাশনাল কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন।

২২শে নভেম্বর বাদ জোহর আজিমপুর কবরস্থানে জানাজা শেষে সেখানেই আলী ইমামকে সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 06, December 2022, Tk. 25.00

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভাস্কর শামীম শিকদার কর্তৃক 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ভাস্কর্যটি বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাসকে ধারণ করে নির্মিত

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd